আগামী সংখ্যায়
সত্যজিৎ রায়-এর প্রতি
কিচির মিচিরের শ্রদ্ধার্ঘ্য

কিচির মিচির

যোগাযোগ : ৯৪৭৭৮ ৩৭০৭৭, ৯৪৩৩২৬৪৩৯৪

১ বর্ষ ১ প্রস্তুতি সংখ্যা | ১৫ এপ্রিল ২০১৪, ১ বৈশাখ, ১৪২১ | মূল্য : ১০ (দশ) টাকা

বর্ন টু ফ্লাই

পাখিদের প্রজাতি নিয়ে যেমন বৈচিত্রের অন্ত নেই, তেমনই তাদের আচার আচরণ নিয়েও মজার ঘটনার শেষ নেই। ধরো, তুমি কোনো এরোপ্লেনে চেপে যাচ্ছো। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে নজরে এল শুধুই জল, অর্থাৎ সমুদ্রের ওপর দিয়ে বিমান উড়ে চলেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উন্নত মানের দিক নির্ণয়ের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েই পাইলট এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিমানটিকে নিয়ে যান। কিন্তু পাখি? ভাবলেই অবাক হতে হয়, অনেক পরিযায়ী পাখিদের মতোই আমেরিকান গোল্ডেন প্লোভার শীতের ছুটি কাটাতে আলাস্কা থেকে হাওয়াই পর্যন্ত একটানা উড়ে যায়। কোনো দিক নির্দেশ যন্ত্র নেই, মাঝখানে শুধুই জল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম বা খাওয়া-দাওয়া করার জন্য কোনো দ্বীপও নেই। গোল্ডেন প্লোভার সাঁতারও জানে না। তাই একবার উড়লে টানা উড়তেই হবে। প্রায় ৮৮ ঘণ্টা টানা উড়তে হয় আমেরিকান গোল্ডেন প্লোভারকে। পেরিয়ে যায় প্রায় ২,৫০০ মাইল দূরত্ব। এই পথ উড়তে পাখিটিকে কমবেশি ২.৫ লক্ষ বার ডানা নাড়তে হয়! স্বাভাবিক কারণেই উড়বার আগে বিমানের মতোই গোল্ডেন প্লোভারকে সঞ্চয় করে নিতে হয় জ্বালানি। নাহলে এতটা পথ যাবে কী করে! কিন্তু সমস্যা রয়েছে সেখানেও। বেশি জ্বালানি নিলে শরীর ভারি হবে, তাহলে উড়তে অসুবিধা। শুধু তাই নয়, পাখিটিকে জ্বালানির ব্যবহার সম্পর্কেও থাকতে হয় সচেতন। বেশি গতিতে উড়লে বেশি জ্বালানি লাগবে, আবার কম গতিতে উড়লে সময় ও জ্বালানি দুটোই বেশি লাগবে। সব কিছু হিসেব করেই উড়তে শুরু করে গোল্ডেন প্লোভার। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, পাখিটি যখন উড়তে শুরু করে তখন তার ওজন থাকে ৭ আউন্স, যার মধ্যে ২.৫ আউন্স থাকে চর্বি বা ফ্যাটজাতীয় পদার্থ যা তাদের উড়বার প্রয়োজনীয় জ্বালানি। দেখা গেছে, গোল্ডেন প্লোভার প্রতি ঘণ্টায় ০.৬ শতাংশ ফ্যাটজাতীয় পদার্থকে শক্তিতে

বল্ড ঈগল

বহু পাখি রয়েছে যারা মানুষের মতোই সমাজ গড়ে, খাবার সংগ্রহ করে, তারা সন্তানও পালন করে।

(এরপর ৪ পাতায়)

আমাদের কথা

সেরা বলা যাবে না। একজনের মতে যেটা সেরা, অন্যজনের মতে সেটা যে সেরা হবেই এমন কথা নেই। তবে সাহিত্য জগতে সেরার দৌড়ে থাকতে গেলে যে প্রস্তুতি নিতে হয়, যে বাছাই পর্বের মধ্যে দিয়ে গিয়ে লেখা নির্বাচিত হয় সেটা সম্পূর্ণ করেই কিচির মিচির-এর আত্মপ্রকাশ।

কিচির মিচির-এর বিভিন্ন সংখ্যায় যাঁরা লিখবেন তাঁরা স্বনামধন্য তো বটেই, শিশু, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেও সমান জনপ্রিয়। লেখক/লেখিকাদের মধ্যে থাকছেন শৈলেন ঘোষ, নারায়ণ দেবনাথ, প্রচেত গুপ্ত, হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, অলক চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ রায়, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, সব্যসাচী চক্রবর্তী, দীপ মুখোপাধ্যায়, অনন্যা দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত, রতনতনু ঘাটি, স্বপ্না ভট্টাচার্য, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, দেবীপ্রসাদ দুয়ারি, শ্যামল চক্রবর্তী, বুলবুলি বন্দ্যোপাধ্যায়, সহেলি চট্টোপাধ্যায়, কাবেরী রায়চৌধুরী, অপরাজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীন্দ্র ভৌমিক, পার্থ বসু, একরাম আলি, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, অরুণ সেনগুপ্ত, মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, চন্দন নাথ, কালিপদ চক্রবর্তী, সন্বিত বসু, দেবাশিস দত্ত, নির্বেদ রায়, অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হারাধন সাহা, সাগর ভট্টাচার্য প্রমুখ। কিচির মিচির-এর অলঙ্করণে শিল্পী দেবব্রত ঘোষ, তাপস সরকার।

– কিচির মিচির টিম

হাঁদাভোদা ও বাঁটুলের উৎস সন্ধানে

''আরে কেল্টুদা, তোমার হাতে এয়ারগান। ওটা দিয়ে তুমি কী করবে?'' ''লক্ষ্যভেদ প্র্যাকটিস করবো।''

প্রশ্নকর্তা নন্টে আর উত্তরদাতা বিখ্যাত কেল্টুদা। কাহিনিটির নাম 'শিকার'। মনে পড়ছে?

২০১৫ সালে যারা উচ্চমাধ্যমিকের নম্বর-শিকারি, অর্থাৎ যারা বেশি নম্বর পেতে চাও তাদের মনে পড়তেই হবে নন্টে-ফন্টে-কেল্টুদার কাহিনি। কারণ বেশি নম্বর পাওয়ার লক্ষ্যকে ভেদ করতে পড়তে হবে নন্টে-ফন্টের কাণ্ডকারখানা। উচ্চমাধ্যমিকের নতুন সিলেবাসে শুধু নন্টে-ফন্টে নয়, হাঁদা-ভোদাও ঠাঁই পেয়েছে। এদের স্রষ্টা অশীতিপর কার্টুনিস্টকে দেওয়া হয়েছে সাহিত্যিকের সম্মান। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা পেরিয়ে কার্টুন কমিকসের জগত পেয়েছে জয়ের আস্বাদ। হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে-ফন্টে, বাঁটুল দি গ্রেট-এর জনক, প্রখ্যাত কমিকস নির্মাতা **নারায়ণ দেবনাথ**-এর বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল **'কিচির মিচির'**। খুদে পড়ুয়াদের কাছে তিনি তুলে ধরলেন তাঁর পয়লা কমিকস করার কথা। **সম্বিত বসু**'র সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় তিনি যা যা বললেন তাই স্থান পেল এই প্রথম সংখ্যায়।

কিচির মিচির : প্রথমেই কমিকস স্রষ্টা হিসেবে 'সাহিত্য আকাদেমি' পাওয়ার জন্য কিচির মিচিরের পক্ষ থেকে অভিনন্দন।

নারায়ণ দেবনাথ : ধন্যবাদ।

কিচির মিচির : কমিকস যে একটা সাহিত্য, সেটা স্বীকৃতি পাওয়ায় আপনার কী বক্তব্য?

নারায়ণ দেবনাথ : কমিকসের চল এখানে কোনো দিনই ছিল না। লোকে বলত এ আবার কী! ছবি নিয়ে গল্পও যে এক ধরনের সাহিত্য, কেউ তা বুঝতেই চাইত না। সিলেবাসে আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খুশি হয়েছি। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় আরো বেশি করে আনন্দ হচ্ছে। আসলে কমিকসে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেরও একটা আলাদা মূল্য আছে।

কিচির মিচির : বিদেশে কমিকসের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে।

নারায়ণ দেবনাথ : বিদেশে ছবিতে গল্প নিয়ে যা কাজকর্ম, তা সাহিত্যে মূলধারার সঙ্গেই যুক্ত। টিনটিনের স্রষ্টা হার্জ বেলজিয়ামে দারুণ সম্মান পান। বাঙালিদের মধ্যে এই নিয়ে একটা নাক-উঁচু ভাব রয়েছে।

কিচির মিচির : কিন্তু গোটা বিশ্বের সঙ্গে আপনিই সমানে সমানে পাল্লা দিয়েছেন।

নারায়ণ দেবনাথ : হ্যাঁ। ২০১২ সালেই হাঁদা-ভোঁদা ৫০ বছরে পা দিয়েছে। বিশ্বের জনপ্রিয় কমিকস যদি নজর করেন তাহলে দেখা যাবে যে এই সব কমিকস একজন এঁকেছেন, একজন লিখেছেন, একজন সেটাকে রঙিন করে তুলেছেন। আমি কিন্তু একা হাতেই সবটা করেছি। সেই কাজেরই স্বীকৃতি পেয়েছি।

ছবি শান্তনু ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত

কিচির মিচির : প্রথম কমিকস তৈরির কথা যদি বলেন।

নারায়ণ দেবনাথ : পয়লা ঠিক কবে সেটা আজ আর মনে নেই, মনে করতে পারছি না। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে মনে হয়। যেটা কমিকসের শুরু। কার্টুন ও কমিকস একসঙ্গে বলা হয় বটে, কিন্তু কার্টুন তো একটা অন্য জিনিস। এটা সাধারণত রাজনৈতিক নেতা বা বিখ্যাতদের নিয়ে করা হয়। তাঁদের ক্যারিকেচার। তাঁদের চরিত্র ভেঙে চুরে একটু মোটা নাক, লম্বা নাক - এই পর্যন্তই। কমিকসটা তো ক্যারিকেচার নয়। আমার পয়লা কমিকস বলতে গেলে সেই পঞ্চাশ দশকে শুরু ...

কিচির মিচির : তার আগে.....

নারায়ণ দেবনাথ : তার আগে যা ছিল তা ইলাস্ট্রেশন, ওই গল্পের ছবি আঁকা। এরপরেই শুরু কমিকস তৈরি। প্রথমেই 'দেব সাহিত্য কুটির'-এর হয়ে আমি গল্পে ছবি আঁকি। কমিকসও।

কিচির মিচির : সেখান থেকেই হাঁদা-ভোঁদা?

নারায়ণ দেবনাথ : কিছুটা সেই রকমই। আমাকে বলা হয় ছোটোদের জন্য গল্পে কমিকস করতে। তখন আমি হাঁদা-ভোঁদার কাণ্ডকারখানা নাম দিয়ে কমিকস শুরু করি।

কিচির মিচির : হাঁদা-ভোঁদার চিন্তাটা কীভাবে এল?

(এরপর ৮ পাতায়)

টিনটিন

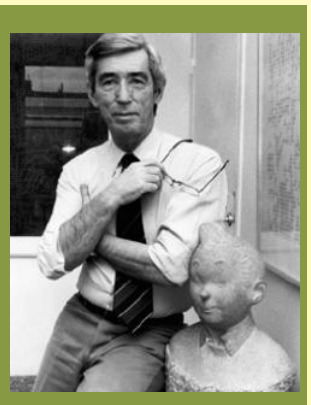

পৃথিবীর জনপ্রিয়তম কমিকস-এর মধ্যে অন্যতম টিনটিন। তৈরি করেছেন শিল্পী জর্জ রেমি যাঁকে আমরা 'হার্জ' নামেই বেশি চিনি। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত টানা ৪৭ বছর তিনি আমাদের টিনটিন কমিকস উপহার দিয়েছেন। টিনিটিন কমিকস-এর গল্প ও ছবি হার্জ করলেও তাঁর সহকারী ছিলেন ৬জন শিল্পী। তাঁদের কেউ আঁকতেন প্লেনের ছবি; কেউ শুধু পেনসিল স্কেচ করতেন, কেউ করতেন রং।

অ্যাসটেরিক্স

দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্বের অন্য যেসব শিল্পী কমিকস তৈরি করছেন, লাভ করেছেন চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতেই অবস্থান ইউদেরজোর। তাঁকে আমরা 'অ্যাসটেরিক্স' কমিকস-এর

(এরপর ৮ পাতায়)

গুপ্তধন

সরু মোটা

প্রমথ চৌধুরী

আমি যখন আমার আত্মীয় শ্রীকণ্ঠবাবুর পুত্র নীলকণ্ঠের ফকিরহাট কাছারির আদায়কারী ছিলাম তখন একদিন শুনলুম যে নীলকণ্ঠবাবুর দুজন বন্ধু পাড়াগাঁ দেখতে আসছেন। আমরা যেমন কলকাতায় যাই চিড়িয়াখানা দেখতে, তাঁরাও তেমনি কলকাতা থেকে মফঃস্বল নামক চিড়িয়াখানা দেখতে আসছেন এবং আমাদের কাছারিতে দিনকতক থাকবেন।

নীলকণ্ঠবাবুর কলকাতার বন্ধুরা স্টেশন থেকে তিন মাইল পথ এলেন একজন গরুর গাড়িতে। আর একজন রামছাগলে টানা ছেলেদের ঠেলাগাড়িতে। এর কারণ, এক বন্ধু ছিলেন রোগা এবং দ্বিতীয় বন্ধু নবনীমোহন ছিলেন মোটা। এত মোটা যে তাঁকে চর্বির গোলা বললেও হয়। তিনি সুন্দর কী অসুন্দর তা বলতে পারি নে। কারণ, তাঁর নাক, চোখ সব মাংস আর চর্বিতে ডুবে গেছে।

শুনলুম তাঁরা নাকি খুব কম খান। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে খানকতক বাসি লুচি ও গুড়, আর কাঁচা ছোলা ও কাঁচা মুগের ডাল। দুপুরবেলা ভাত খেতেন না, খেতেন চালের পায়েস আর তার সঙ্গে পান্তোয়া প্রভৃতি মিষ্টান্ন, বিকেলে এক বাটি ক্ষীর, ও তার সঙ্গে আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলপুকুরি। রাত্রে খেতেন পরোটা, মাছের কোপ্তা ও মাংসের কাবাব, তার ওপর এক বাটি ক্ষীর।

নবনীমোহন লোকটি অতিশয় নির্বিবাদী। যা দেখতেন, তাতেই আশ্চর্য হয়ে যেতেন - যথা খড়ের চাল, দরমার বেড়া, আর আমাদের মতো জানোয়ারদের আচার-ব্যবহার। তাঁর ছোটো ছোটো চোখে যা পড়ত, তাই নাকি অতি নতুন আর অতি সুন্দর।

এদিকে ধনপতিবাবু অর্থাৎ রোগা লোকটি ছিলেন সব বিষয়ে উদাসীন। এমন কি, তাঁর কোনো কথায় কিংবা ব্যবহারে টাকা গরমাইয়ের পরিচয় পর্যন্ত কোনোদিন পাইনি। আমাদের তিনি জানোয়ার হিসেবে দেখতেন না, দেখতেন শুধু অসভ্য মানুষ হিসেবে।

ধনপতিবাবু সভ্যতার নানা রকম মাল-মশলার অভাবে সর্বদাই অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করতেন। তিনি ঘড়ি ঘড়ি সিগারেট খেতেন, অথচ সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই যথেষ্ট সঙ্গে আনেন নি, ফকিরহাটের কাছারিতে দেশলাই পাবেন এই ভরসায়। কিন্তু আমাদের কাছারিতে দেশলাই ছিল না। আমরা তামাক খেতুম, আর কলকের টিকে ধরাতাম চক্‌মকি ঠুকে। একথা আমাদের মুখে শুনে ধনপতিবাবু তার বন্ধুকে বলেন। তিনি তা শুনে মহা উল্লোসিত হয়ে ওঠেন এবং বন্ধুকে বলেন, ''তুমি চক্‌মকি ঠুকে সিগারেট ধরাও না কেন, যস্মিন দেশে যদাচার।''

তিনি উত্তর করেন, ''আমি চক্‌মকি ঠুকতে পারি নে, আর তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সিগারেটের মুখে ফেলতেও পারি নে।''

তাতে নবনীমোহন বলেন, ''তুমি তো হাতের কাজ কিছুই করতে পার না, কি করে চক্‌মকি ঠুকতে হয় এঁরা আমাকে দেখিয়ে দিন, আমি তোমার কাজ করে দেবো।''

আমার ডাক পড়ল, এবং ধনপতিবাবুর আদেশে আমি তাঁদের সমুখেই, চক্‌মকি কি করে ঠুকতে হয় ও পাথর থেকে আগুন বার করতে হয় তা দেখিয়ে দিলুম।

এক নজরেই নবনীমোহন এ বিদ্যা শিখে নিলেন, এবং আমাকে বললেন, ''ও পাথর আর লোহা আমার কাছে রেখে যান, আমি যা করবার তা করব।''

খানিক পরে আমি পাশের ঘর থেকে ঠুং ঠুং শব্দ শুনলুম। তার পরেই ধনপতিবাবু চিৎকার করে উঠলেন, ''কে আছ, নবনীবাবুকে এসে রক্ষা করো। সে পুড়ে মরছে।''

আমি তাদের শোবার ঘরে ছুটে গিয়ে দেখি, নবনীমোহন কাঠের চৌকিতে বসে আছেন, আর তাঁর পাশে মেঝের ওপর ইন্দ্রধনুর সব রকম রঙের পশমে তৈরি একটি গলাবন্ধ পড়ে আছে। চক্‌মকি একবার সজোরে ঠুকতে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কে গিয়ে সেই গলাবন্ধের উপর পড়েছে। পশমে আগুন লেগে গেছে, আর তা থেকে শুধু ধোঁয়া বেরুচ্ছে। নবনীমোহন তাঁর স্থূলদেহ নিয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সেখান থেকে নড়তে পারছেন না।

আমি তার উপর এক ঘটি জল ঢেলে দিতেই সব নিভে গেল।

এরপর ধনপতিবাবু তাঁর বন্ধুকে কড়া হুকুম দিলেন - ''আর যেন আগুন নিয়ে খেলা করা না হয়। আমরা এখানে হাওয়া খেতে এসেছি, আগুনে পুড়ে মরতে নয়।''

নবনীমোহনের শখ হল - একদিন ডিঙি চড়ে জলবিহার করবেন।

ধনপতিবাবু তাঁর বন্ধুর সকল শখ মেটাতে দিবারাত্র প্রস্তুত ছিলেন। তাই ঠিক হল, নবনীমোহনকে একদিন ডিঙিতে চড়িয়ে বিলের ভিতর একচক্র ঘুরিয়ে আনা হবে।

আমি একটি খুব ভালো আর টঙ্ক ডিঙি দেখে, সেই ডিঙিতে নবনীমোহনকে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করলুম। তার পর সে ডিঙি একেবারে পাড়ের সঙ্গে সেঁটে দেওয়া হল, যাতে তাঁর চড়তে কোনো কষ্ট না হয়।

তিনি এক পা লাফিয়ে ডিঙির মধ্যিখানে গিয়ে বসলেন। অমনি তাঁর গুরুভারে ডিঙির মাঝখানটা ফেঁসে গেল, আর তিনি একটা কুণ্ডলী আকার ধারণ করলেন। পা-দুটো উঁচু হয়ে উঠলো, মাথাও তাই। বাদবাকি দেহ এক হাত জলে ডুবে গেল।

ধনপতিবাবু অমনি ''নবনীমোহন জলে ডুবে মল'' বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

আমরা ছুটে দিয়ে দেখলুম তাঁর জলে ডোববার কোনো ভয় নেই, কিন্তু তাঁকে ঐ ডিঙির ভাঙা খোল থেকে উদ্ধার করাই কঠিন। টেনে বার করা যায় না, নিজেরও বেরিয়ে আসবার শক্তি নেই।

তখন করাত দিয়ে আর কুড়ুল দিয়ে ডিঙিটাকে দুখণ্ড করা হল, আর নবনীমোহনের কোমরে কাছি দিয়ে বাঁধা হল। একটি চাকর সেই একহাত জলে নেমে তাঁকে ঠেলতে লাগল, আর দুজন সর্দার সেই কাছি টানতে লাগল। ডিঙির আধখানা এধারে আধখানা ওধারে চলে গেল - সহজে নয়, জেলেরা লগি মেরে সরিয়ে দিল। তার পরে নবনীমোহনকে ডাঙায় তোলা হল। তিনি ডিঙির তলার ফাঁকে গেঁথে গিয়েছিলেন। তাঁর পরনে ছিল ঢাকাই ধুতি। তাঁকে দেখে মনে হল - তিনি একটিল একমেঠে ঠাকুরের প্রতিমা।

তখনি স্থির হল যে, তাঁরা পরদিন সকালেই কলকাতা ফিরে যাবেন।

হলও তাই। তাঁরা যেভাবে এসেছিলেন, সেই ভাবেই স্টেশনে গেলেন।

এ গল্প তোমাদের বলছি এই শিক্ষা দেবার জন্য যে, কখনো মোটা হোয়োনা। অবশ্য কি করে যে মোটাকে রোগা করা যায়, তা আমি জানিনে - স্বয়ং ধন্বন্তরিও জানেন না, তবে বেশি মোটা না হবার হয়ত দু-চারটি সোজা উপায় আছে, যথা ঃ অতিভোজন না করা, ও চলে-ফিরে বেড়ানো।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা সাহিত্যিক প্রথম চৌধুরী ১৮৬৮ সালের ৭ আগস্ট বর্তমান বাংলাদেশের যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্র সমসাময়িক এই সাহিত্যিক ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর ৭৮ বছর বয়সে কলকাতায় প্রয়াত হন। 'বীরবল' ছদ্মনামে তিনি প্রচুর সাহিত্য রচনা করেছেন। 'সবুজ পত্র' সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনার কাজও করেছেন। এই সাহিত্য পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র বহু কবিতা এবং 'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস দুটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশ চন্দ্র ঘটক, ইন্দিরাদেবী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ বহু মনীষী 'সবুজ পত্র'তে লিখেছিলেন। উল্লেখ্য, 'সবুজ পত্র' শতবর্ষ অতিক্রম করছে এই বছরেই। 'পাঁচ-সাত', 'পদচরণ', 'খেয়াল খাতা', 'চার ইয়ারি কথা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

অদ্বৈত মল্লবর্মন

'তিতাস একটি নদীর নাম'। কালজয়ী এই উপন্যাসের স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মন। তিনি ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়াও 'সাদা হাওয়া' এবং 'রাঙামাটি' নামে আরও দু'টি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের জীবনী নিয়ে আরভিং স্টোনের লেখা 'লাস্ট ফর লাইফ'-এর বঙ্গানুবাদ করেন অদ্বৈত, নাম দিয়েছিলেন 'জীবনতৃষা'। সাংবাদিকতা করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। মাত্র ৩৭ বছর বেঁচে ছিলেন এই লেখক তথা ঔপন্যাসিক।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পেশায় সাংবাদিক আদতে সমাজ সংস্কারক দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮১৪ সালে। দক্ষিণারঞ্জনের প্রথম জীবনের প্রেরণা ছিলেন ডিরোজিও। ১৮৩১ সালে সংবাদপত্রের উপর সরকারি দমনপীড়নের বিরুদ্ধে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। যুক্ত ছিলেন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে। তাঁর দানের জমিতেই গড়ে উঠে বেথুন স্কুল। ডেভিড হেয়ারকেও বিভিন্ন সামাজিক কাজে সহায়তা করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

বর্ন টু ফ্লাই

(১ পাতার পর)

রূপান্তরিত করে। অঙ্কের হিসেব অনুযায়ী, ৮৮ ঘণ্টায় পাখিটি ৩ আউন্স জ্বালানি ব্যবহার করে। অথচ তার কাছে আছে ২.৫ আউন্স জ্বালানি। তাহলে কী আলাস্কা থেকে তারা হাওয়াই পর্যন্ত যেতে পারে না? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ পারে। এই সফলতার পিছনেও লুকিয়ে আছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের ভাষায় পাখির শরীর তৈরি ‘এয়ারো-ডায়নামিক’ পদ্ধতিতে। সোজা কথায়, পাখির শরীর এমনভাবেই তৈরি যাতে ওড়বার সময় বাতাসের সঙ্গে সবথেকে কম ঘর্ষণ হয়। একইভাবে তোমরা খেয়াল করে থাকবে পাখির দল আকাশে ইংরাজি ‘ভি’ আকৃতির মতো করে ওড়ে। এতে বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণ কম হয়। যে ভাবে সে নিজেই নিজের জ্বালানি শরীরে ভরে নেয়

সেভাবেই পাখি শিখে যায় একা একা হাওয়াই পৌঁছানো সম্ভব নয়। দলবদ্ধ হয়ে ইংরাজি ‘ভি’ আকৃতিতে উড়ে চলো, তাহলেই কম লাগবে জ্বালানি। পৌঁছেও যাবে গন্তব্যে। প্রতিটি পরিযায়ী পাখির ক্ষেত্রেই এই বিষয়টি সত্যি।

এতো গেল পরিযায়ী পাখি গোল্ডেন প্লোভারের কথা। বহু পাখি রয়েছে যারা মানুষের মতোই সমাজ গড়ে, খাবার সংগ্রহ করে। তারা সন্তান পালন করে, পাখি সমাজে সমস্যা হলে বিচারসভা বসিয়ে তা মেটায়, প্রয়োজনে শত্রুকে আক্রমণ করে, নিজের প্রতিবেশীকে সাহায্য করে। আরও মজার ব্যাপার, বুদ্ধির দৌড়েও তারা কম যায় না। আমাদের আশেপাশে থাকা কাক, টিয়া, শালিকের কথা আলাদা করে বলার দরকার পড়ে না। মানুষের মতোই পাখিদের মধ্যে শিল্পী, গায়কও রয়েছে। যুদ্ধের সময় যেমন মানুষ অস্ত্র ব্যবহার করে তেমনই হাতিয়ার বানিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করতেও কোনো কোনো পাখি কম যায় না।

(এরপর ৬ পাতায়)

পেটসেটেরা

পাখি পোষা। ‘পেট’ বা পোষ্য হিসেবে পাখি মন্দ নয়, বরং বলা চলে ভালই। কিন্তু পোষ্য হিসেবে পাখিকে বাছার আগে তোমাদের কিছু বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, একটা পাখি বাড়ির সৌন্দর্য অনেকাংশেই বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। পাশাপাশি, বাড়িতে পোষ্য রাখার খুব ইচ্ছে অথচ বাইরে ঘোরাতে নিয়ে যেতে চাইছো না (কুকুরকে যেমন নিয়ে যেতে হয়) এবং লোমযুক্ত কোনো প্রাণিও তোমার পছন্দের তালিকায় নেই তাহলে পাখির বিকল্প খুব কমই আছে। এসো দেখে নিই পোষ্য নেওয়ার আগে কি কি অবশ্যই চিন্তা করার দরকার।

প্রথমত, তোমার জীবনধারণের সঙ্গে কোনো পাখি পোষ্য নেওয়া খাপ খাচ্ছে কি না তা মিলিয়ে নাও। যথেষ্ট সময় ও এনার্জি কিন্তু পাখির পিছনে ব্যয় করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অনেকেই ভাবে খাঁচার পাখির জন্য শুধুমাত্র জল, খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতা দিলেই যথেষ্ট। তোমাদের জানিয়ে রাখি, পৃথিবীতে কোনো প্রাণিকেই খাঁচায় বন্দি হয়ে থাকবার জন্য প্রকৃতি তৈরি করেনি। ২৪ ঘণ্টা খাঁচায় থাকতে কোনো পাখিই পছন্দ করে না।

পাখি পোষার ১০ কারণ

১) পাখি খুবই বুদ্ধিমান। পাখিদের নতুন বিষয় শিখবার আলাদা ক্ষমতা আছে। এখনো পর্যন্ত আমরা পাখিদের ছোট্ট মস্তিষ্কের খুব কম অংশই বিশ্লেষণ করতে পেরেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তোমাদের সব পছন্দ, পাখিদের পছন্দ নাও হতে পারে। দীর্ঘদিন একই পরিবেশে থাকলে পাখিদের মধ্যেও নিজের ক্ষতি নিজেই করবার প্রবণতা জন্মাতে পারে।

২) অন্যান্য যে কোনো পোষ্যর থেকে পাখির রক্ষণাবেক্ষণ সহজ। কুকুর বা বেড়াল বাড়ির সব জায়গায় ঘুরে বেড়াবে। সেই তুলনায় তুমি যখন পড়াশুনায় ব্যস্ত বা স্কুলে গেছ তখন পাখি খাঁচাতে অনায়াসে থাকতে পারে। কুকুর বা বেড়ালকে টয়লেট বা পটি করাতে বাইরে নিয়ে যাওয়ার থেকে পাখির খাঁচা নিয়মিত পরিষ্কার করা অনেক সহজ কাজ। মনে রাখতে হবে, পাখিকে খাঁচায় আটকে রাখতে পারলেও অনেক সময়তেই পাখিরা কোলাহল জুড়ে দেয়।

৩) পাখিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই সহজ। তোমরা জানলে খুশি হবে যে পাখিরা শিখতে খুব ভালবাসে। সবথেকে বড়ো কথা পাখিরা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও পছন্দ করে। কুকুরের থেকে পাখিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সোজা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, টিয়া পাখি খুব সহজেই বিভিন্ন শব্দ, কথা নকল করতে পারে। হঠাৎ কোনো দিন টিয়াটি তোমার কথা নকল করে তাক লাগিয়ে দিতে পারে।

৪) পাখির খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। পাখিরা প্রকৃতিগত ভাবেই নিজেরা নিজেদের পরিষ্কার করতে পারে।

৫) পাখিরা খুবই সামাজিক, বহু পাখি কুকুর-বেড়ালের মতোই মানুষের সঙ্গে একটা বন্ধন গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু এটা মিছরির ফলার মতোই সাঙ্ঘাতিক হতে পারে যদি না তুমি বাড়ির পাখিটার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ সময় দাও। অনেক ক্ষেত্রে কিছু পাখি খাঁচার বাইরে থেকে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কাটাতে পছন্দ করে। আবার পরিবারের কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আক্রোশও দেখাতে পারে।

৬) পাখিদের খাওয়ানোর খরচ কম। যত ছোটো পোষ্য, ততই কম খাদ্য। পাখি বিশেষে তারতম্য হলেও অঙ্কুরিত দানা শস্য, ফল ও সবজির টুকরো পাখির মূল খাদ্য। তবে অনেক বহুমূল্য ও দুর্লভ পাখির খাওয়ার খরচ মাসে ৩-৪ হাজার টাকাও হয়। পালক যুক্ত পোষ্যকে অন্তত বছরে একবার পক্ষী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখিয়ে নেওয়া দরকার। পাখিরা রোগ লুকানোয় ওস্তাদ। তাই নিয়মিত রক্ত পরীক্ষাও করাতে হয়। সেই অনুযায়ী খাদ্য তালিকাও তৈরি করতে হবে।

(বাকি অংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

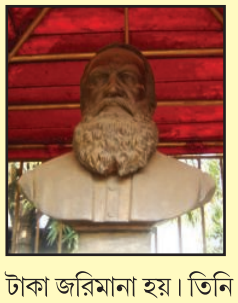

জেমস লঙ

জন্মসূত্রে আইরিশ, পাদ্রী জেমস লঙ ১৮১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চলতি বছরে তাঁর জন্মের দু’শো বছর পূর্ণ হচ্ছে। আমরা সকালেই জানি দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কিন্তু বাংলার নীলকর সাহেবরা জেমস লঙের বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিচারে লঙ সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড এবং হাজার টাকা জরিমানা হয়। তিনি বাঙালি না হয়েও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত সমস্ত গ্রন্থের তালিকা ও বাংলা বইয়ের ক্যাটালগ প্রকাশ করেন। মজার কথা হল, জেমস লঙের একটি অবিস্মরণীয় কাজ বাংলা প্রবাদের সংকলন ও প্রকাশ। এই প্রকাশনায় ছিল তিন হাজার বাংলা প্রবাদ।

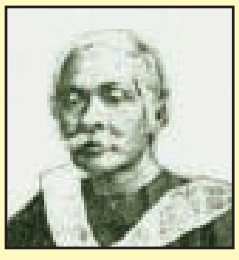

প্যারীচাঁদ মিত্র

আমরা সকলেরই প্যারীচাঁদ মিত্রকে তাঁর ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর নামে বেশি চিনি। তাঁর লিখিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসে প্রথম কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবহার বাংলা ভাষায় নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। পরবর্তী সময়ে এই ভাষাকে ‘আলালী ভাষা’ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এই বই তথা উপন্যাসের জন্যই প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় ও অমর হয়ে রয়েছেন। প্যারীচাঁদের জন্ম ২৪ জুলাই, ১৮১৪। তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘অভেদী’, ‘আধ্যাত্মিকা’।

গল্প

ঝুমঝুম ও কুকুরছানা

অনন্যা দাশ

ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল ঝুমঝুম। গা হাত পা ঘামে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। বুকটা এখনও টিপটিপ করছে। কী বাজে স্বপ্ন রে বাবা! তবে এই রকম স্বপ্ন এখন প্রায় রোজই দেখে ঝুমঝুম। মাস দুয়েক হল বাবা-মার সাথে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরেছে সে। কলকাতায় একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ইংরাজিটা সে ভালই জানে বা অন্য বিষয়গুলোতেও ওর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। অঙ্কও ঠিক আছে। ঝামেলাটা হচ্ছে শুধু বাংলা নিয়ে! ছ'মাস বয়স থেকে ঝুমঝুম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল। সে বাংলা বলতে বা বুঝতে পারে কিন্তু লেখা বা পড়াটা একদমই পারে না। জোনাকি কাকিমার কাছে বাংলা শিখেছে সে কিন্তু একটু তো সময় লাগবে। ইতিমধ্যে বাংলা ক্লাসের টিচার ওকে প্রায়ই ক্লাসে রিডিং পড়তে দিয়ে দেন। ঝুমঝুমের ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা পড়া শুনে ক্লাসের অন্য মেয়েদের সেকি হাসি! ভয়ানক রাগ হয় ঝুমঝুমের। কই দেবাঙ্গনা যখন হোঁচট খেয়ে খেয়ে ইংলিশ রিডিং করে তখন তো কেউ হাসে না! আর ওর বেলাতেই যত্তসব!

ওকে স্কুলে ভর্তি নেওয়ার সময় অবশ্য প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, ''মাস খানেক বাদেই ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা। ও যদি তার মধ্যে বাংলা শিখে নিতে পারে তো ভাল। ফেল করলে কিন্তু ওকে আমাদের স্কুলে আর রাখা যাবে না। আমাদের স্কুলের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে।''

সেই ভয়টাই রোজ কুরে কুরে খায় ঝুমঝুমকে। দুঃস্বপ্নটাও সেটা নিয়েই। বাংলা ক্লাসে ঝুমঝুম কী একটা পড়ছে, হঠাৎ দেখে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম চলে এসেছেন। ওর পড়া শুনে মেয়েগুলো সব হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে আর ম্যাডাম কটমট করে ওর দিকে তাকাচ্ছেন।

এক পাতা পড়ার পরই উনি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'না প্রজ্জলিতা, আমি দুঃখিত কিন্তু তোমাকে এই ক্লাসে আর রাখা যাবে না। হ্যাঁ, লোয়ার কেজিতে একটা সিট খালি আছে, তুমি যদি সেখানে যেতে চাও তো সেটার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।''

লজ্জায় ঘৃণায় ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলছিল ঝুমঝুম আর তখনি ওর ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে উঠেই সে কান্নাকাটি জুড়ে দিল যে সে স্কুলে যাবে না কিছুতেই। সেটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। ইদানীং ঝুমঝুম প্রায়ই ওই রকম করে। ওর মা-বাবা ওকে নিয়ে বেশ চিন্তিত বাংলা নিয়ে ওর মনে একটা ভয় জন্মে গেছে বলে। বাংলা বই দেখলেই সে পালায় অথচ ইংরাজি গল্পের বই গোগ্রাসে গিলছে। জোনাকি কাকিমার কাছে টিউশান পড়তেও যেতে চায় না। কারণ ওখানেও যে দু-চারজন আসে পড়তে তারাও ওর বাংলা শুনে হাসাহাসি করে। তারপর যখন লতামাসি বৃষ্টি আর মিষ্টিকে নিয়ে বেড়াতে এলেন তখন ঝুমঝুম একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে রইল, কিছুতেই বেরল না ওদের সামনে।

সেদিনও বিকেলবেলা ওই রকম মন খারাপ করে বসে ছিল ঝুমঝুম এমন সময় কানে মধু ঢালা একটা শব্দ শুনতে পেল, ''ভৌ!''

তড়াক করে লাফিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দেখল বাবা অফিস থেকে ফেরার সময় সঙ্গে করে একটা কুকুরছানা নিয়ে এসেছেন। একেবারে ধবধবে সাদা, ভীষণ মিষ্টি।

ঝুমঝুম তো কুকুরছানা পেয়ে খুব খুশি। সঙ্গে সঙ্গে ওর নাম দিয়ে দিল স্নোই। টিনটিনের গল্পে ওর কুকুর স্নোইকে খুব ভাল লাগে ঝুমঝুমের। স্নোই নামটা শুনে কুকুরছানা বলল, ''ভৌ''। বলেই ঝুমঝুমের পা-টা একটু চেটে দিল।

বাবা সব দেখে হেসে বললেন, ''নামটা মনে হয় ওর পছন্দ হয়েছে।''

চা খেতে খেতে বাবা আরো বললেন, ''স্নোই কিন্তু সাধারণ কুকুরছানা নয়! ও খুব গল্প শুনতে ভালবাসে। আমার অফিসের একজন বন্ধুর বাড়িতে ওর জন্ম। ওই ভদ্রলোক মেয়ে পিঙ্কি আর ছেলে তাতাইকে রোজ রাতে গল্প শোনান। সে গল্প, স্নোই, ওর মা-বাবা, ভাই বোন সবাই মিলে শোনে। রোজ রাতে ঘুমোবার আগে ওদের গল্প শোনাতেই হবে, নাহলে ওদের ঘুমই আসে না।''

ঝুমঝুম বলল, ''তাতে আর ভাবনার কী আছে? আমি ওকে হ্যারি পটার থেকে শুরু করে সব গল্প পড়ে শুনিয়ে দেবো।''

বাবা মাথা নাড়লেন, ''না, সেখানেই তো গণ্ডগোল। স্নোই তো কলকাতার কুকুর। ও তো ইংরাজি গল্প শুনতে অভ্যস্ত নয়, ও শুধু বাংলা গল্প শোনে। তা সে ব্যবস্থাও আমি করে এনেছি। এই নাও।'' বলে বাবা ব্যাগ খুলে বেশ কিছু বাংলা বই বার করে ঝুমঝুমকে দিলেন।

রাতে শোওয়ার সময় স্নোইকে নিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঝুমঝুম প্রথম বইটা খুলল। টুনটুনির বই। প্রথম লাইনটা পড়তে গিয়েই তিনবার হোঁচট খেল সে কিন্তু স্নোই কিছুই বলল না। নিবিষ্ট মনে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এক দুবার ওর পাটাও চেটে দিল। মনে একটু সাহস পেল ঝুমঝুম। মাথায় হাত বুলিয়ে একটা গল্প শোনাতেই ঘুমিয়ে পড়ল স্নোই।

তারপর থেকে স্নোইকে রোজই গল্প পড়ে শোনাতে লাগল ঝুমঝুম। ঘরের দরজা অবশ্য বন্ধই রইল। স্নোইকে গল্প পড়ে শোনাতে ওর ভয় নেই। স্নোই ওর উচ্চারণ শুনে হাসে না, থমকে গেলে টিটকিরি কাটে না, বিভোর হয়ে মন দিয়ে গল্প শোনে। টুনটুনির বই পড়া শেষ হয়ে গেছে ঝুমঝুমের, এবার 'ঠাকুমার ঝুলি'টা ধরেছে।

সেদিন বাংলা ক্লাসের টিচার ওকে রিডিং পড়তে দিলেন আবার। ভয়ে ভয়ে বই হাতে নিয়ে পড়তে গিয়ে ঝুমঝুম দেখল ওর বাংলা পড়তে এখন আর তত অসুবিধা হচ্ছে না। উচ্চারণগুলো একটু উল্টো-পাল্টা হচ্ছে বটে কিন্তু হোঁচট খেতে হচ্ছে না, দিব্যি গড়গড় করে পড়ে যেতে পারছে।

ওর পড়া শেষ হতেই টিচার বললেন, ''এই তো অনেক উন্নতি করে ফেলেছ। এমনি ভাবে চালিয়ে গেলেই দেখবে আর বেশিদিন লাগবে না।''

বাড়ি ফিরে মাকে সেই কথা বলতে মাও খুব খুশি হলেন।

সেদিন রাতে বাবা নিজের আমেরিকার বন্ধু শমীককাকুকে ফোন করলেন।

''শমীক? আমি দেবু বলছি।''

''হ্যাঁ, ভাল আছি। তোর আইডিয়াটা অসাধারণ কাজ দিয়েছে।''

ওদের কথা শেষ হতে ঝুমঝুম বাবাকে গিয়ে ধরল, ''বাবা, তোমাকে কী আইডিয়া দিয়েছিলেন শমীককাকু?''

''আরে বাবা! স্নোইকে আনার বুদ্ধিটা ওই তো দিয়েছিল। ও বলেছিল আমেরিকাতে বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে দেখেছেন যেসব বাচ্চারা স্নোইর মতন শান্ত, গল্প শুনতে ভালোবাসে কুকুরদের গল্প পড়ে শোনায় তারা অন্য বাচ্চাদের চেয়ে তাড়াতাড়ি পড়তে শেখে।''

বাবা আরো বোঝালেন যে ঝুমঝুম মোটেই একা নয়। পৃথিবীতে ওর মতন আরো অনেক বাচ্চাই আছে যারা ঠিক করে পড়তে পারে না বলে অন্যরা তাদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে। সেই লজ্জায় তারা আর পড়তেই চায় না। স্নোইর মতন শান্ত কুকুরছানারা চুপ করে শোনে, কোনো দোষ ধরে না বলে ওদের সামনে রিডিং পড়লে বাচ্চাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে ওঠে। যেটা ঝুমঝুমের হয়েছে।

ঝুমঝুম এখন খুব ভাল বাংলা পড়তে লিখতে শিখে গেছে। ওর আর কোনো অসুবিধা হয় না। ফার্স্ট টার্মিনালে কোনো রকমে পাশ করলেও সেকেন্ড টার্মিনাল পরীক্ষায় বাংলাতে মোটামুটি ভালই নম্বর পেয়েছে। সে আর অন্য বিষয়গুলোতে তো সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। ওর ক্লাস টিচার বলেছেন বাংলাতে আর কয়েক নম্বর বেশি পেলেই ও ফার্স্ট হয়ে যেতে পারত, এখন থার্ড হয়েছে। উচ্চারণও প্রায় ঠিক হয়ে গেছে তাও এখনও রোজ রাতে স্নোইকে গল্প পড়ে শোনায় ঝুমঝুম। গল্প শেষ হলে স্নোই মনের আনন্দে একটা 'ভৌ' করে। ঝুমঝুম ধরেই নিয়েছে যে সেই ভৌটা মানে 'থ্যাঙ্ক ইউ' আর তারপরেই সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ে।

অঙ্কন : তাপস সরকার

বর্ন টু ফ্লাই

(৪ পাতার পর)

পাখির অন্য নাম খেচর। অর্থাৎ 'খে' বা আকাশে চরে যে তারাই খেচর। পাখিদের ওড়া নিয়ে মজার অন্ত নেই। অ্যালবাট্রস নামের এক প্রজাতির সমুদ্র পাখি একটানা সমুদ্রের ওপর দিয়ে বহু মাইল পথ চলে গিয়েও পথভুল না করে ফিরে পুনরায় নিজের বাসায় আসতে পারে। অনেক সময় এরা ডানা না নেড়ে সমুদ্রে ওপর দিয়ে শুধুই বাতাসে ভেসে চলে। আবার বাতাসে উড়তে উড়তে স্থির হতে পারে ঈগল। পাখিদের মধ্যে সবথেকে দ্রুতগতিতে ওড়ে সোনালি ঈগল, ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার। শিকারের সময় এদের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটারে পৌঁছে যায়! সোয়ালো পাখিরা ৫০ ঘণ্টা কিছু না খেয়ে সাহারা মরুভূমির ওপর দিয়ে একটানা উড়ে চলতে সক্ষম।

আই ইউ সি এন-এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে ৯,৮৬৫টি প্রজাতির পাখি পৃথিবীতে থাকলেও ১৫০০ সালের পর থেকে ১৩৩টি পাখি বিলুপ্ত হয়েছে। ১,৩০০ পাখির মাথার ওপর ঝুলছে অবলুপ্তির খাঁড়া। পৃথিবীতে সবথেকে বেশি পাখি লুপ্ত হয়েছে হাওয়াই দ্বীপে।

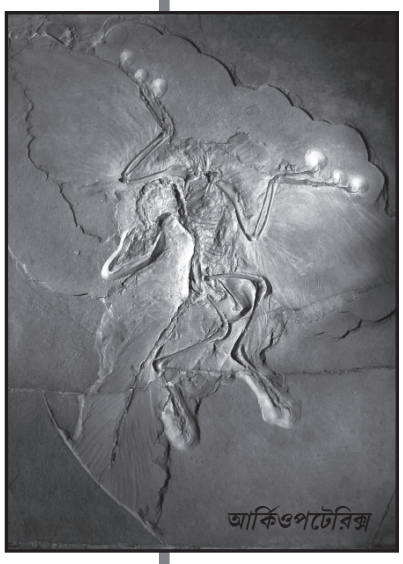

আর্কিওপটেরিক্স

পৃথিবীর আদিমতম পাখি হিসেবে সরীসৃপ ও পাখি দুয়েরই বৈশিষ্ট্যযুক্ত আর্কিওপটেরিক্স স্বীকৃতি পেয়েছে। এদের পালক ও ডানা থাকলেও পাখিদের মতো ঠোঁট না হয়ে এদের ছিল সরীসৃপের মতো দাঁত। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এরা সরীসৃপের মতো পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করত। এখন পর্যন্ত ১০টি আর্কিওপটেরিক্স-এর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম জীবাশ্মটি 'লন্ডন স্পেসিমেন' নামে পরিচিত।

বিশ্বের বহু দেশের জাতীয় পতাকায় রয়েছে পাখিদের ছবি। যেমন আলবেনিয়ায় ডাবল হেডেড ঈগল, ডোমিনিকায় সিসেরো টিয়া, ইকুয়েডরে আন্ড্রিয়ান কন্ডোর, মিশরে সালাদিন ঈগল, মলডোভায় ঈগল, পাপুয়া নিউ গিনিতে প্যারাডাইস, সেন্ট হেলেনায় একটি অচেনা পাখি, উগান্ডায় ধূসর বক, আমেরিকার ভার্জিন দ্বীপে বল্ড ঈগল, জাম্বিয়ায় ঈগল ইত্যাদি। জেনে রাখা ভাল, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের কোনো জাতীয় পাখি নেই।

পাখিকে কেন্দ্র করে আমেরিকায় রয়েছে জাতীয় ছুটির দিন। কথিত আছে, ১৬২১ সালে কিছু তীর্থযাত্রী যাজক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। তাদের খাদ্যতালিকায় স্থান পায় বুনো টার্কি পাখির মাংস। তারা স্থানীয় আমেরিকানদেরও আমন্ত্রণ জানান। তারপর থেকেই নাকি খ্রিষ্টানদের 'থ্যাঙ্কস গিভিংস ডে'-তে টার্কির মাংস খাওয়ার রেওয়াজ চালু হয়। ১৮৬৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ঘোষণা করেন

শকুন

নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার হবে জাতীয় ছুটির দিন। এদিন টার্কির মাংস দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন হবে।

আমরা অনেকেই শকুন দেখেছি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শকুনের মাথা হয় নেড়া। গলা ও ঘাড়েও কোনো পালক থাকে না। ফলে যখন কোনো মরা ও পচা প্রাণিদেহ এরা মাথা ঢুকিয়ে খায়, তখন প্রাণিদের দূষিত রস মাথায় ও গায়ে লাগলেও স্নানের সময় তা ধুয়ে যায়। ফলে এরা দূষণ ও ক্ষতির হাত থেকে বাঁচে। তবে মজার ব্যাপার হল শকুন মরা, পচা, গলা খাবার খেয়ে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখলেও নিজেরা কখনোই অসুস্থ হয় না। অন্যদিকে, মুম্বইয়ের পার্সিরা শকুনকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন। পার্সিরা মনে করেন, মাটিতে মৃতদেহ কবর দেওয়া মানে সেটি মাটি ও মাটির নীচে জল দূষিত করে। তারা মৃতদেহ মালাবার পর্বতে রেখে দেন শকুনের খাবার হিসেবে। এটাকে বলা হয় 'স্কাই ব্যুরিয়ালস'। এই প্রথা চালু রয়েছে তিব্বতের বৌদ্ধদের মধ্যেও।

আমাদের রূপকথার গল্পের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, শুক-সারির কথা বারে বারেই এসেছে। তেমনই বাইবেলে ৩০টি বিভিন্ন ধরনের পাখির কথা উল্লেখ রয়েছে। এরা হল মোরগ, শ্যেন, বাজ, বক, হুপো, চিল, টিট্টিভ, নাইটেঙ্গল, অসপ্রে ঈগল, পেলিক্যান, পায়রা, কোয়েল, দাঁড়কাক, চড়ুই, সোয়ালো, মরাল, ক্রৌঞ্চ বক, শকুন ইত্যাদি। অন্যদিকে, শেক্সপিয়ার তাঁর লেখায় ৪৯ রকমের পাখির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, বাল্টি, বাজার্ড, চৌগ, ককরেল, কর্মোরান্ট, কাক, ঈগল, শ্যেন, রাজহংসী, নীলকণ্ঠ, দাঁড়কাক, চিল, চাতক, নাইটেঙ্গল, অসপ্রে ঈগল, উটপাখি, পেঁচা, টিয়া, তিতির, ময়ূর, পেলিকন, পিজেন্ট, পায়রা, কোয়েল, রবিন, কাদাখোঁচা, চড়ুই, স্প্যারো হক, স্টারলিং, কাঠমুরগি, রেন ইত্যাদি।

এবারে আসি অন্য একটা বিষয়ে। লক্ষ্য করলে দেখবে, পাখিরা কখনোই গাছের ডাল থেকে পড়ে যায় না, এমনকী ঘুমের সময়েও নয়। কারণ এদের পেশিবন্ধনী, যা ডালে বসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিঠ থেকে পায়ে নেমে আসে ও গাছের ডালের সঙ্গে শক্ত বাঁধন সৃষ্টি করে। যখন এরা ফের উড়তে যায় তখন এরা প্রথমে পা খাড়া করে সোজা হয়ে ওঠে ও গা ঝাড়া দিয়ে এই পেশিবন্ধনীকে শিথিল করে।

পাখির বাসা নিয়েও কম গল্প নেই। তবে বাসা বানানো নিয়ে আমাদের বাবুই পাখির জুড়ি মেলা ভার। তবে, বল্ড ঈগলের কিছু কিছু স্বভাব বেশ মজাদার। এই ঈগল একই বাসায় বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। তবে কিছুদিন অন্তর অন্তর নতুন পাতা ও ডালপালা দিয়ে সাজিয়ে তোলে। এমনই একটি বল্ড ঈগলের বাসা পাওয়া যায় যার বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর। তবে আর একটি মজার ব্যাপার হল বাসাটির ওজন দু'টনে পৌঁছে ছিল। অন্যদিকে, বাসা নিয়ে শকুনেরা কখনোই ঝগড়া করে না। কারণ তারা গাছের কোটর, পাহাড়ের গায়ের গর্তে ডিম পাড়তেই পছন্দ করে।

একটু ইতিহাসের কথায় আসা যাক। ঘটনার সত্য মিথ্যা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে, তবে গ্রিক নাট্যকার অ্যাসকিলিস (৫২৫-৪৫৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)-র মৃত্যু বেশ রোমহর্ষক। এক জ্যোতিষী তাঁকে জানান যে তিনি স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে মারা পড়বেন। এরপর তিনি নাকি আর বেশিদিন বাঁচেননি। একদিন বাড়ির উঠোনে বসেছিলেন। সেইসময় একটি ঈগল কচ্ছপ ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাসকিলিসের চকচকে টাক মাথা দেখে পাথর বলে ভুল করে কচ্ছপটিকে সরাসরি অ্যাসকিলিসের মাথার ওপর ফেলে দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই মৃত্যু হয় এই মহান নাট্যকারের।

মানুষতো শৌর্য, সাহসিকতার জন্য পুরস্কার পেয়ে থাকে। শুনলে অবাক হবে, সাহসিকতা ও শৌর্যের জন্য আমেরিকায় প্রাণিদের 'Dickin Medal' দেওয়া হয়। এই হিসেবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ৩১টি পায়রা পুরস্কার পায়। পৃথিবীতে সবচেয়ে বিখ্যাত পায়রা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

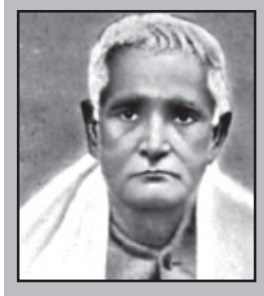

১৮৬৪ সালের ২০ আগস্ট মুর্শিদাবাদের এক অখ্যাত গ্রামে এই মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় বিজ্ঞানের অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ছাত্র জীবনেই বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখি করতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা', 'চরিতকথা', 'কর্মকথা', 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উন্নতির জন্যও অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। কর্ম জীবনে তিনি রিপন কলেজের (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

শ্যামাচরণ সরকার

১৮১৪ সালে বহু ভাষাবিদ শ্যামাচরণ সরকারের জন্ম। তিনি নিজের প্রচেষ্টাতেই হিন্দি, ইংরেজি, পার্সি, উর্দু, গ্রিক, সংস্কৃত ও বাংলা ইত্যাদি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করে পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। তিনি ইংরাজি-বাংলা-উর্দু অভিধান রচনা করেন। তিনি লর্ড ডালহৌসির অনুবাদক হিসেবেও কাজ করেছিলেন। এছাড়া মুসলিম ও হিন্দু আইনের ওপরও বই লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভারত-সভার প্রথম সভাপতি শ্যামাচরণ নিজের জন্মগ্রামে শিশুদের বিনাব্যয়ে শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রীদের সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক, ধর্মীয় আলোচনা করতেন। শ্যামাচরণ যেকোনো নীতিহীন কাজের বিরোধী ছিলেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান দোভাষীর কাজও করেছেন।

বর্ন টু ফ্লাই

(এরপর ৭ পাতায়)

(৬ পাতার পর)

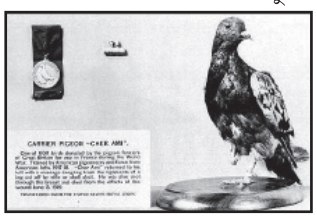

‘চিয়ার আমি’ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন বাহিনীর হয়ে কাজ করে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এটি ১২টি গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠাতে সক্ষম হয় এবং ফ্রান্সে আরগনির ৭৭ ডিভিসনে প্রায় হেরে যাওয়া যুদ্ধ জেতাতে সাহায্য করে। শেষবার এই পায়রাটি তার বুকে গুলি খায়, তবু মরার আগে সে নির্দিষ্ট জায়গায় বার্তাটি পৌঁছে দেয়। চিয়ার আমি’কে সাহসিকতার পুরস্কার ‘Croix-de-Guerre’ সম্মানে ভূষিত করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ‘জি আই জো’ পায়রাটি ইতালিতে কাজ করেছিল। এটির প্রধান স্মরণীয় অভিযান ছিল ১ হাজার সৈনিকের জীবন বাঁচানো। জি আই জো-কে সাহসিকতার পুরস্কার ‘Dickin Medal’ দেওয়া হয়। ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিক গেমসে শ্যুটিংয়ে জীবন্ত পায়রা মারা হয়। যদিও ঘটনার নৃশংসতার জন্য আর কোনো দিন অলিম্পিকে এমন ঘটনা দেখা যায়নি।

মিউজিয়ামে ‘চিয়ার আমি’ স্মারক

পাখি শুধু নিজের জন্য নয়, আমাদের পরিবেশকেও রক্ষা করে। একসময় মরিশাস দ্বীপে ‘ট্যামবালাক’ গাছ প্রচুর জন্মাত। হঠাৎ করে এই গাছের সংখা কমে যায়। ১৯৭০ সাল নাগাদ এই দ্বীপে মাত্র ১৩টি গাছ দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন, সপ্তদশ শতকে ডোডো পাখি বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে এই গাছটির সংখ্যাও কমতে থাকে। এই গাছটির বীজ ডোডো পাখি খাওয়ার পর সেটি তাদের পাচন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গেলেই সেটিতে অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব। ফলে ডোডোরা বিলুপ্ত হওয়ার পরে এই গাছ জন্মানোও বন্ধ হয়ে যায়। তবে পরবর্তী সময়ে টার্কি জাতীয় এক পাখির সাহায্যে ফের নিরাপদ করা গিয়েছে এই গাছের প্রজাতিকে। আমাদের কাককে ‘বটের পাখি’ বলা হয়। বটের বীজ বা ফল কাক মুখে করে অন্য জায়গায় নিয়ে ফেলে এবং নতুন বট গাছের সৃষ্টি করে। এরকম বহু গাছের জীবনচক্রের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে পাখি। সেই অর্থে পরিবেশ রক্ষায় পাখির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শুনলে আশ্চর্য হবে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে বা সমুদ্রে পাড়েই থাকে এমন পাখিরা নোনতা জল পান করলেও অসুস্থ হয় না। কারণ এদের মাথায় ‘ডিস্যালাইনেশন’ গ্রন্থি থাকে যা জল থেকে লবণ আলাদা করে দেয়। পূর্ব আফ্রিকায় ‘গ্রেট রিফ’ উপত্যকা রয়েছে। সেখানে অসংখ্য হ্রদের জলে সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ অনেক বেশি। সোডার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি তানজানিয়ার ন্যাট্রোন হ্রদে। অন্য কোনো পাখি না থাকলেও ফ্লেমিঙ্গোদের প্রচুর সংখ্যায় এখানে দেখা যায়। আসলে এদের ঠোঁটে বিশেষ ধরনের ফিল্টার থাকে যা দিয়ে সোডিয়াম কার্বেনেট বাদ দিয়ে শুধু জলটুকুই পান করতে পারে।

স্যানগ্রাউস পাখি বাসা বাঁধে উত্তর আফ্রিকার মরু অঞ্চলে। এরা বাচ্চাদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে বহু মাইল পথ উড়ে যায়। জল পেলে এরা বুকের পালকগুলি ভিজিয়ে নেয়, তারপর সেই ভেজা পালক সমেত ফের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। বুকের পালকের বিশেষ অবস্থার জন্য ভালো পরিমাণ জল বয়ে আনতে সক্ষম হয় এই পাখিটি। পাখিটির বাচ্চারা পালকের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে এই জল পান করে।

কোকিলের স্বভাবই কাকের বাসায় ডিম পাড়া। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে কোকিলের মতো ডাকতে শুরু করলেই কাকেরা তাড়া করে। তখন বাচ্চা কোকিল তাদের পিতা-মাতা যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই উড়ে যায়। অথচ বাচ্চা কোকিল কোনোদিনই তার বাবা-মা কোকিলকে দেখেনি। কিন্তু পথ চিনতে ন্যূনতম ভুলচুক হয় না কোকিলদের। আসল কথা হল, পরিযায়ী বিষয়টি কোকিলের মজ্জাগত। আমাদের কাঠঠোকরা একদিনে ৮ হাজার থেকে ১২ হাজার বার শক্ত গাছে ঠোক্কর মারতে পারে। তবে এতবার ঠোক্কর মেরেও এদের মাথা ধরে না। কারণ এদের মাথার খুলি খুবই শক্ত এবং মাথায় ‘শক অ্যাবজর্ব’ করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

> ১৯৭০ সাল নাগাদ এই দ্বীপে মাত্র ১৩টি গাছ দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন, সপ্তদশ শতকে ডোডো পাখি বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে এই গাছটির সংখ্যাও কমতে থাকে।

পাখিদের নিয়ে আরও মজার মজার কাহিনি রয়েছে। একটি সংখ্যায় সব বলা সম্ভব নয়। পরে অন্য কোনও সংখ্যায় আবার পাখি নিয়ে গল্প করা যাবে। পাখি চিনতে বা আমাদের দেশের পাখিদের নিয়ে জানতে চোখ রাখতে পারো ইন্টারনেটে। অমিত ও দেবপ্রিয়া ঘোষের www.bengalbirds.info এবং সুমিতকুমার সেনের www.calcuttabirds.com পাখিদের সম্পর্কে তোমাদের অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

তা আবোল ল

বাড়ির পাশেই নাইরোবি ন্যাশনাল পার্ক। বিখ্যাত সিংহ, গণ্ডার ও অন্যান্য প্রাণির আবাসস্থল হিসেবে। পার্কের পাশেই অবস্থিত বাড়িগুলিতে হানা দিত বিশালাকৃতি সিংহেরা। তুলে নিয়ে যেত গবাদি পশু। মাসাই উপজাতির বছর নয়েকের বালক রিচার্ড টিউর তাই সিংহদের একদমই পছন্দ করতো না। রিচার্ডের বাবা তাকে রাতে গবাদি পশু পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল। গবাদি পশুদের ওপর সিংহের আক্রমণ ঠেকাতে গ্রামের লোকেরা বিষ, বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতো। বিষ প্রয়োগের ফলে বহু সিংহ মারাও যেত। এটাও পছন্দ ছিল না রিচার্ডের।

লায়ন লাইট

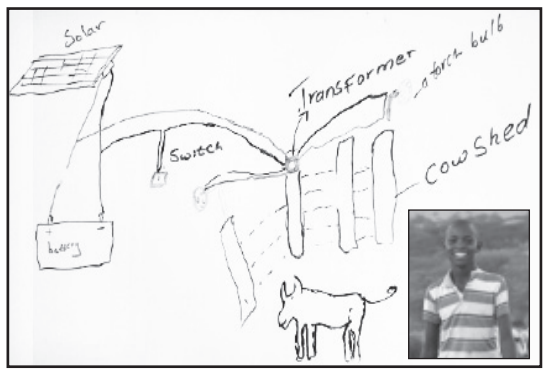

লায়ন লাইটের মডেল। (ইনসেটে রিচার্ড টিউর)

একদিন রাতে পাহারা দেওয়ার সময় রিচার্ড লক্ষ্য করল চলমান আলো সিংহের দল ভয় পায়। এটা লক্ষ্য করেই রিচার্ড বানিয়ে ফেলল একটি বিশেষ আলোক ব্যবস্থা। একটি তারে বেশ কয়েকটি বাল্ব লাগিয়ে ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত করা হল। সেই ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হল সৌরশক্তি। এমনভাবেই সার্কিটটি তৈরি করল রিচার্ড যাতে একসঙ্গে সবকটি বাল্ব না জ্বলে একটার পর একটা জ্বলে। এই জ্বলে ওঠাকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে কেউ আলো হাতে পায়চারী করছে। এই আলোর ব্যবহারে কমল সিংহের উৎপাত। আলোটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘লায়ন লাইট’। এখন সেখানকার বেশিরভাগ বাড়িতেই রয়েছে এই আলো। রিচার্ড পেয়েছে স্কলারশিপ, পড়াশুনার সুযোগ। কমেছে সিংহের মৃত্যুর ঘটনাও।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

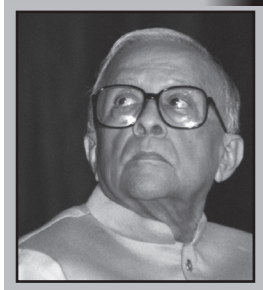

জ্যোতি বসু

একটানা কোনো অঙ্গরাজ্যে ২৪ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী থেকে যিনি সারা বিশ্বে পরিচিত হয়েছিলেন সেই জ্যোতি বসু ১৯১৪ সালের ৮ জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পেশায় ব্যারিস্টার হয়েও স্ব-ইচ্ছায় রাজনীতির পথকে বেছে নেন। ১৯২০ সালে ধর্মতলার লরেটো গার্লস স্কুলে পড়াশোনার জন্য প্রথমে ভর্তি হন। পরে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়াশোনা করেন। রেলশ্রমিক আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। দলের ইচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবিদার হয়েও গ্রহণ করেননি। বহু বইও তিনি লিখে গিয়েছেন।

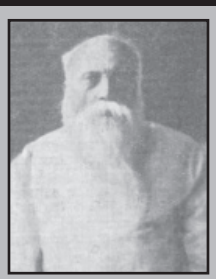

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

আধুনিক ভারতে ফিলজফি বা দর্শনশাস্ত্রের পথিকৃৎ হিসেবে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পরিচিত। তাঁর জন্ম ১৮৬৪ সালে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত’র (বিবেকানন্দ) সহপাঠী ব্রজেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে সিটি কলেজের অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত হন। আচার্য প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান চালান। সেই অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য একত্রিত করে ১৯১৫ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘পজিটিভ সায়েন্সেস অফ অ্যানসিয়েন্ট হিন্দুজ’ প্রকাশিত হয়। তিনি ভাস্করাচার্য প্রণীত অঙ্কের তত্ত্বকে নিউটনের গাণিতিক তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয় প্রমাণের চেষ্টা করেন।

শিশু সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

'ঠাকুরদা মারা গেলে পর, তাঁর লোহার সিন্দুকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি ছোট বাক্স পাওয়া গেল। সে বাক্সর ভিতর কোন দামী জিনিস আছে মনে করে মা সেটি খুলে ফেললেন। কিন্তু তার মধ্যে পাওয়া গেল শুধু একখানা পকেট বুক, আর একখানা ময়লা-কাগজ মোড়া কি একটা জিনিস। মা কাগজটা খুলেই জিনিসটা ফেলে দিয়ে হাঁউ-মাঁউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

হেমেন্দ্রকুমার রায়।

....আমি হেঁট হয়ে দেখলুম, একখানা মড়ার মাথার খুলি মাটির উপর পড়ে রয়েছে! আশ্চর্য্য হয়ে বললুম 'লোহার সিন্দুকে মড়ার মাথা'।...

ঠিক এভাবেই ১৯২৪ সালে ছোটোদের 'মৌচাক' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা রোমাঞ্চকর, অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'যখের ধন'। দুই শিক্ষিত বাঙালি যুবক বিমল-কুমার এ উপন্যাসের নায়ক। তাদের সঙ্গী ভৃত্য রামহরি এবং 'বাঘা' নামের এক দেশি সারমেয়। ঠাকুরদার সিন্দুকে পাওয়া নোটবুক আর মড়ার খুলিতে আঁকা অদ্ভুত গাণিতিক নক্সার সূত্র ধরে তারা পাড়ি জমিয়ে ছিল দূর্গম কামরূপ পাহাড়ে যখের ধন উদ্ধারের জন্য। বাঙালি যুবকদের এক অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর অভিযান। লেখকের নাম 'হেমেন্দ্রকুমার রায়'(১৮৮৮-১৯৬৩)। জীবদ্দশাতেই যিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'শিশুসাহিত্য সম্রাট' নামে। 'যখের ধন' উপন্যাসটি তিনি ছোটোদের জন্য লিখলেও উপন্যাসটি ছোটো-বড়ো সব পাঠকের কাছে এতটাই সমাদৃত হয় যে ঐ চরিত্রদের নিয়েই ১৯৩১ সালে তিনি লিখে ফেললেন আরো একটি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'আবার যখের ধন'। এবার উপন্যাসের পটভূমি ইস্ট আফ্রিকা। সুন্দরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বিমল-কুমার পাড়ি জমাল শ্বাপদসঙ্কুল আফ্রিকার 'কারাগো' পাহাড়ের গুপ্তধনের খোঁজে। রহস্যঘন এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় কত রহস্য রোমাঞ্চের ঘনঘটা। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষার গল্প। ঘটোৎকচ, মাখনবাবু, সিংহদমন গাটুলা সর্দারের মতো কত ভয়াল, বিচিত্র চরিত্র! যা সৃষ্টিকরা একমাত্র শিশুসাহিত্য সম্রাটের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

একটা সময় ছিল, যখন প্রকাশকরা ভাবতেন, তাদের বই কি কেউ পড়বে যদি তাদের বইতে না থাকে হেমেনবাবুর 'পদ্মরাগবুদ্ধ' 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' বা 'সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন'-এর মতো কোনও লেখা? প্রকাশকদের ভাবনা অমূলক ছিল না। শিশুকিশোর পত্রিকা অথচ হেমেন্দ্রকুমারের লেখা থাকবে না পাঠকরা এ ব্যাপারটা মেনে নিতে পারবেন না। শুধু সে সময় নয়, এই ইন্টারনেটের যুগেও আমরা যে কোনো বয়সি পাঠকরা যদি তাঁর লেখা পড়তে বসি তাহলে আজও একই রকম রোমাঞ্চ অনুভূত হয়। স্থান-কাল-পাত্রের বেড়াজাল অতিক্রম করে আজও পাঠকদের টেনে রাখে তাঁর লেখার চুম্বকশক্তি। ১৯২০ সালে 'রুদ্রমশাল' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর লেখা প্রথম গল্প। 'ময়নাবতীর মায়াকানন', 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', 'রত্নগুহার গুপ্তধন', 'জেরিনার কণ্ঠহার', 'সুলুসাগরের ভুতুরে দেশ'-একের পর এক বিচিত্র উপন্যাস তিনি উপহার দিয়ে গেছেন আমাদের। কখনো সে উপন্যাসের পটভূমি হিমালয়, কখনো আফ্রিকা, কখনোবা প্রশান্ত মহাসাগরের

(এরপর ১১ পাতায়)

বাঁটুলের উৎস সন্ধানে

(২ পাতার পর)

নারায়ণ দেবনাথ : তখন এই হাওড়া শহরের হুটোপুটি খেলাধুলো, যা হয় আর কি, সেগুলো দেখতাম বসে বসে। আমাদেরই জুয়েলারি দোকানের সামনে ছিল রক। সেই রকে বসেই আমি দেখতাম, মজা লাগত। তখন এত গাড়িঘোড়া নেই। এত লোকজন নেই। যানবাহন বলতে সাইকেল। না হয়, পদব্রজে। কমিকস-এর জন্য যখন বলা হল আমাকে এইসব ঘটনাগুলোই আমার মাথায় এল। ওইগুলোকেই পত্রাকারে সাজিয়ে শুরু হল এই কমিকস। গল্পগুলো করেছিলাম সাধারণের জন্য, ছোটোদের কথা ভেবে এবং তাদের নিশ্চয়ই ভালোই লেগেছিল। কিন্তু সবসময়ে তো ওই দেখাগুলো নিয়ে কমিকস করা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই ফুরিয়ে যায় সেইসব। এরপর কল্পনা মিশিয়ে গল্প লেখা শুরু করলাম। এই কমিকসটি বছরখানেক চলার পর আবার আমাকে অনুরোধ করা হল আরেকটা যদি কমিকস করা হয়।

কিচির মিচির : হাঁদাভোদার পরে তাই এল বাঁটুল।

নারায়ণ দেবনাথ : হ্যাঁ। মাথায় ঘুরতে লাগল নতুন কমিকস করতে হবে। কিন্তু কি নিয়ে করব? এইরকম ভাবতে ভাবতে নামটা এল হঠাৎ। 'বাঁটুল দি গ্রেট'। নামটা চলে আসার পরে একটা ক্যারেকটার তৈরি করতে হবে বলে নানারকম আঁকিবুঁকি করতে লাগলাম। করতে করতেই এসে গেল বাঁটুল।

কিচির মিচির : শুনেছি ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের সঙ্গে বাঁটুল তৈরির একটা যোগসূত্র আছে।

নারায়ণ দেবনাথ : অবশ্যই। যখন আমাদের যুদ্ধ লাগল পূর্ব-পাকিস্তান, এখনকার বাংলাদেশের সঙ্গে। তখন পত্রিকার দফতর থেকে বলা হল বাঁটুলকে ফিল্ডে নামিয়ে দিন, আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম খানিক। দেশে কোনো বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হবে না তো! ওঁরা উত্তর দিলেন এখন যুদ্ধ হচ্ছে, আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন। তখন আমি বাঁটুলকে ফিল্ডে নামালাম।

প্রথম ব্যাটম্যান কমিকস্-এর প্রচ্ছদ।

ওদের তাড়া করে যাওয়া, বড় বড় ট্যাঙ্ক ওদের দিকে হানিয়ে দেওয়া, এসবই বাঁটুল করেছে। এইসব নানারকম অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানা দিয়ে বাঁটুল শুরু হল। সে বেশ পছন্দের হয়ে উঠল লোকের। একসময় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। তারপরও চলতে লাগল বাঁটুল।

(২ পাতার পর)

শিল্পী হিসেবেই চিনি। ১৯৬১ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ৪৮ বছর এঁকেছিলেন 'অ্যাসটেরিক্স' কমিকস। উল্লেখ্য

অ্যাসটেরিক্স-এর স্রষ্টা ইউদেরজো

অ্যাসটেরিক্স কমিকস-এর গল্প কিন্তু লিখেছেন গোচিনি। এই দুই লেখক ও শিল্পীর সম্মিলিত প্রয়াসের সমন্বয় অ্যাসটেরিক্স।

অবলা বসু

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী অবলা বসু ১৮৬৪ সালের ৮ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা তথা দেশে নারীশিক্ষা প্রচার ও প্রসারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই কাজের জন্য ১৯১৫ সালে তিনি 'নারী শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। বিধবাদের আর্থিক সহায়তার জন্যও নারী শিক্ষা সমিতি কাজ করত। এছাড়াও অবলা দেবী মহিলা শিল্প ভবন, বিদ্যাসাগর বাণীভবন, বাণীভবন ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি তহবিল গঠন করেন। এছাড়াও বহু ভ্রমণ সাহিত্যও তিনি লিখেছেন যা অবশ্য জগদীশচন্দ্র বসু পরিমার্জনা করেছিলেন।

কৃষ্ণভামিনী দাস

মহিলাদের সমানাধিকারের দাবি তুলে প্রচলিত সমাজ ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন কৃষ্ণভামিনী দাস। তিনি ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিবাদী প্রবন্ধ 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' তৎকালীন সময়ের একটি 'মাইলস্টোন' হিসেবে চিহ্নিত এবং এখনো অবশ্যপাঠ্য। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক বিতর্ক এখনো স্মরণীয়। তাঁর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাস কালাপানি পার করলে দেবেন্দ্রনাথের পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। সবথেকে বড়ো কথা দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রার সময়ে সমাজের কুসংস্কারের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে কৃষ্ণভামিনী স্বামীর সঙ্গী হন। বিলেতে 'বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে বই প্রকাশ করেন। নারী-স্বাধীনতার পক্ষে লেখা বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৪ বছর পর বিলাত থেকে দেশে ফিরে কন্যার অপাত্রে বিয়ে হওয়ায় মা হয়েও তৎকালীন সময়ে তাঁকে স্বামী পরিত্যাগের উপদেশ দেয়। বাংলার নারী-মুক্তি চিন্তায় দুঃসাহসী মহিলা কৃষ্ণভামিনী দাসের এ বছর জন্মের ১৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

ছন্দে আনন্দে

এলে এবং বেলে

রতনতনু ঘাটী

ঠিক ধরেছেন, অলক সেবার ক্লাস এইটে পড়ে
বাতাস হলেই কীসের জন্যে গাছের পাতা নড়ে?
এসব প্রশ্নে আগলপাগল সারাটাদিন তার
সামনে পেলেই আজব প্রশ্নে সকলে জেরবার।
ভুলাই ভীষণ আলগা মনের খেলতে যাবে মাঠে
অলক বলল, "প্রশ্ন ছাড়াই কীভাবে দিন কাটে?
বল তো ভুলাই, নীল আকাশটা কীসের পরে কীসে
কালোয় ঢাকলে বাইরে যাওয়ার বারণ করে পিসে?
বলতে পারিস, রামধনুটা দেখতে কেন বাঁকা?
বলবি কী আর মাথার ভিতর সমস্তটা ফাঁকা!"
কাদের কথায় বৃষ্টিদানায় হিরের ভাইবোনে
স্বপ্ন মাখায়, কোন কবিতার লাইন এলে মনে?
একলা আকাশ বল তো কখন সাদায়-নীলে সেজে
ঘুরতে বেরোয় দূরদূরান্তে, সঙ্গে থাকে কে যে?
বিজ্ঞানে এর বিধান নেই রে, বাংলা বা ইংলিশে
এই বইটার খোঁজ দেবে ঠিক দেবুর বড় পিসে।
নাম বলে দিই সেই বইটার, 'এলে এবং বেলে'
বইটা পেলেই ভাবুকদেরকে পাঠিয়ে দিস মেলে।"

ছোট খোকা

মৃদুল দাশগুপ্ত

পথঘাট শুনশান রেলরোড খাঁ খাঁ
চারপাশ চুপচাপ কুয়াশায় ঢাকা
ক্রশিংয়ের ঘটঘট এলো শেষ ট্রেন
মনে হয় ওই বুঝি বাবা ফিরছেন ...

দিঘিজল টলটল, কচুরির ফুল
ডুব জলে টুপটুপ মা হারালো দুল
তল্লাশে ঝাঁপ দিই তোলপাড় ঢেউ
আমি সেই ছোটো খোকা - মনে রাখো কেউ?

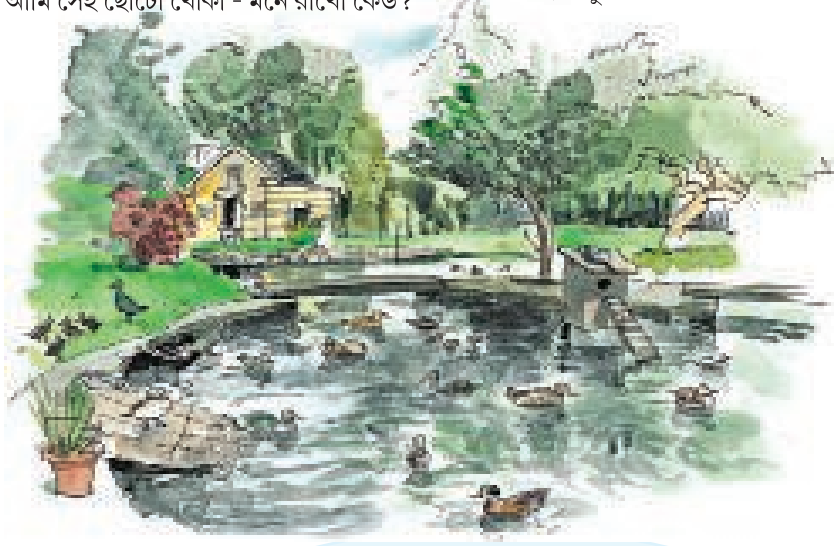

নতুন কিছু করো

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নতুন কিছু করো,
একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো সব কাটো,
কানগুলো সব ছাঁটো;
পাগুলো সব উঁচু ক'রে
মাথা দিয়ে হাঁটো;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও,
ডিগবাজি খাও, ওড়ো;
কিম্বা চিৎপাত হয়ে –
পাগুলো সব ছোঁড়ো;
ঘোড়াগাড়ি ছেড়ে এখন
বাইসিকেলে চড়ো,
–নতুন কিছু করো,
একটা নতুন কিছু করো।

আতঙ্ক নয়, অঙ্ক

অঙ্ক মানেই অনেকের কাছে আতঙ্ক। আসলে তা নয়, অঙ্কের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে হরেক মজা। এই স্তম্ভে অঙ্কের সেই মজাটাকেই তোমাদের সামনে তুলে ধরা হবে। মজার মধ্য দিয়েই তোমরা জেনে নিতে পারবে অঙ্ক রহস্য। দেখবে তখন অঙ্ক জলের মতোই সোজা।

১৯৪০ সাল। নাজি কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের একটি কারা কুঠরী। সামনে কি পেছনে, ডান দিকে কি বাঁ দিকে - শুধু নিরেট পাথরের দেয়াল। একমাত্র গা ঘিনঘিনে বিশ্রি একটা গন্ধ এই দেয়ালের বাধা মানে না। তবু কারা-কুঠরিতে একা বসে থাকাটা এত অসহ্য ঠেকত না যদি মনটা না এমন উতলা হত। কিন্তু হাজার হাজার ছবি ভেসে চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিকার জ্যাকাও ট্রাখ্‌টেনবার্গের মনের পরদার ওপর দিয়ে, ঠিক সিনেমার মতো ...

হিটলারের শাসানি। জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা। যুগোশ্লাভিয়ার পথে পথে রাতের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে শুধু একটু মাথা গোঁজার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে মরা। আশ্রয় মেলার পর খরগোশের মতো মুখ লুকিয়ে গর্তে বসে থাকা। তবু জহ্লাদের শকুনী দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায়নি। হঠাৎ মাঝরাতে একদিন সদর দরজায় ভারি ভারি কালো বুটের দমাদম লাথি - তারপর - বেয়নেটের সামনে দাঁড়িয়ে কাউন্টেস অ্যালিসের দিকে একবার ফিরে চাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে হাতে হ্যাঁচকা টান। ধাক্কার চোটে গাড়ির মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়া। গাড়ি করে নাজি পুলিস গেস্টাপোদের অফিসে হাজির হওয়া। প্রশ্ন আর প্রশ্ন, তারপর ফের যাত্রা। এবার লরির পিঠে। গোরু, মোষকেও বোধহয় এরকম গাড়ি বোঝাই করে চালান দেওয়া হয় না। তারপর এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, অত্যাচারীর আখড়া ...

ট্রাখ্‌টেনবার্গের কাছে এখন সবচেয়ে ভয়ংকর ঠেকে একা বসে নীরবে সময় গোনা। সময় পেরিয়ে যায়, কিন্তু সে আর কতক্ষণ! একটু বাদেই একঘেয়ে লাগে। ট্রাখ্‌টেনবার্গ যোগ করতে শুরু করেন - এক আর দুয়ে তিন, এক আর দুয়ে তিন আর তিনে ছয় ...

যোগের পরে বিয়োগ, তারপর বড়ো বড়ো গুণ আর ভাগ। একদিন হঠাৎ এক মজার ব্যাপার ঘটল। এগারো দিয়ে গুণ করছিলেন ট্রাখ্‌টেনবার্গ। এগারো একে এগারো, এগারো দুয়ে বাইশ ... ট্রাখ্‌টেনবার্গ ভাবতে লাগলেন কোনো উপায় এমন বার করা যায় না যাতে নামতা ছাড়াই গুণ করা যায়।

ট্রাখ্‌টেনবার্গ প্রথমে চুয়ান্নকে এগারো দিয়ে গুণ করলেন -

৫৪ X ১১= ৫৯৪

তারপর ছিয়াত্তরকে এগারো দিয়ে -

৭৬ X ১১= ৮৩৬

এরকম নাড়াচাড়া করতে করতেই তিনি হঠাৎ একটি সূত্র পাওয়া গেছে বলে লাফিয়ে উঠলেন। তিনি দেখলেন এগারো দিয়ে গুণ করলে গুণফলের প্রথম অঙ্ক গুণনীয়ের প্রথম অঙ্কের সমান হচ্ছে। যেমন চুয়ান্নের ক্ষেত্রে প্রথম অঙ্ক চার এবং তার গুণফলের প্রথম অঙ্কও তাই। ছিয়াত্তরের ক্ষেত্রেও একই। এরকম আরো কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতেই ট্রাখ্‌টেনবার্গ নামতা ছাড়াই এগারোর গুণ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেললেন।

কিভাবে আবিষ্কার সেটা আগামী সংখ্যায়। - **নিজস্ব প্রতিনিধি**

কামিনী রায়

কামিনী রায়ের জন্ম ১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' প্রকাশ পায়। তৎকালীন সমাজের প্রচলিত ধারণাকে তছনছ করে ৩০ বছর বয়সে তিনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন (উল্লেখ্য তৎকালীন সমাজে অতি কম বয়সে বিবাহের প্রচলন ছিল।) নারী শিক্ষার প্রসারেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর গীতিকবিতা ছিল প্রসিদ্ধ। 'মহাশ্বেতা', 'পুণ্ডরিক' তাঁর অমৃতাক্ষর ছন্দে লিখিত কাব্য। এছাড়াও 'মাল্যনির্মাল্য', 'জীবনপথে', 'পৌরাণিকী', 'অশোকসঙ্গীত' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র হিসেবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান। বহুমুখী এবং বিরল প্রতিভা আশুতোষ ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অসম্ভব ব্যক্তিত্বের অধিকারী তেজস্বী এই মানুষটির চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য জনগণ তাঁকে 'বাংলার বাঘ' উপাধি প্রদান করে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বৈজ্ঞানিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির দায়িত্ব পালন ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে দীর্ঘদিন আসীন ছিলেন। এই বছরে এই মহান ব্যক্তির জন্মের ১৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

একটু অন্যরকম। হবেই। কারণ লেখার বিষয়টিই একটু স্বতন্ত্র। শুধু মনে নয়, মননেও দাগ কাটবে। খেলা মানে, শুধু খেলাই নয়, খেলার আগে, পিছে বা সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মজাটাকে তুলে ধরাই এই স্তম্ভের মূল লক্ষ্য। - **কিচির মিচির**

অবাক খেলা

অলোক চট্টোপাধ্যায়

না, 'অবাক খেলা' নামে কোনো খেলা নেই। কিন্তু প্রায় সব ধরনের মধ্যেই অবাক হওয়ার মতো বিস্তর ঘটনা আছে। সেই বিস্ময় বা অস্বাভাবিক কাণ্ডের নায়ক বা নায়িকাদের ভুলে যাওয়া সত্যিই কঠিন। একই সঙ্গে ঘটনাগুলোর বৈচিত্রও আমাদের অবাক করে।

তর্ক হতেই পারে, কিন্তু অধিকাংশ খেলাধূলো-ভালোবাসা মানুষ স্বীকার করবেন যে, ফুটবলই গোটা দুনিয়ার সবরকম খেলার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। কেন সবচেয়ে জনপ্রিয় তর্ক হতে পারে তা নিয়েও। ফুটবলের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি এই যে, ফুটবল খেলতে একটা বল আর খানিকটা জায়গা ছাড়া আর কিছু লাগে না। হয়তো এখনো গ্রামবাংলায় ফুটবলের অভাবে মোটামুটি বড়ো আকারের বাতাবি লেবুও ফুটবলের জায়গায় থেকে যথাসম্ভব লাথি খায়। আর সত্যিকারে ফুটবলে কী কী লাগে তা জেনেও তাকে সহজ খেলা বলতে কতজনই বা আপত্তি করবেন?

অঙ্কন : তাপস সরকার

১/১

সাধারণভাবে কোনো ফুটবল ম্যাচে মাঝখানে একটা বিরতি রেখে দুটো অর্ধে খেলা হয়ে থাকে। কিন্তু কোথাও কখনো কি এই স্বাভাবিক ঘটনার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি? গেছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে তাও ঘটেছিল। একদা অর্থাৎ সেই ১৮৯৪-তে ইংল্যান্ডের ইংলিশ লিগ-এর খেলায় ঘটনাটা ঘটেছিল। খেলা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত ম্যাচের রেফারিমশাই অনুপস্থিত। দুটি দল, অর্থাৎ সান্ডারল্যান্ড ও ডার্বি কাউন্টির খেলোয়াড়রা মাঠে নেমে পড়েছেন। কী করা যায় এমন পরিস্থিতিতে? একজনকে রেফারি-বাঁশি দিয়ে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হল। হাফ-টাইম পর্যন্ত খেলা চললো। কিন্তু ততক্ষণে আসল রেফারি এসে পড়েছেন এবং ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে দেখে খুবই বিরক্ত হয়েছেন। এসেই তিনি হুকুম দিলেন প্রথম ৪৫ মিনিটের খেলা বাতিল হবে এবং নতুন করে ৯০ মিনিটের ম্যাচ খেলতে হবে। তাই-ই ঘটলো, খেলোয়াড়দের খেলতে হলো মোট ১৩৫ মিনিট। সান্ডারল্যান্ড দলের অবশ্য তাতে খুব একটা আপত্তি ছিল বলে মনে হয় না। কারণ তারাই ম্যাচটা ১১-০ গোলে জিতেছিল।

১/২

সকলেই মানেন না, কিন্তু কেউ কেউ আজও ভাগ্য ইত্যাদি দিব্যি মানেন। তা দুর্ভাগ্য বা দুর্ঘটনা কতদূর ছন্দবদ্ধ হতে পারে? ফুটবল মাঠে আঘাত পাওয়াও কি অন্য একজন খেলোয়াড়ের মিল রেখে ঘটানো যায়? যায় না, কিন্তু তেমনই ঘটনা ঘটলে কী করে তা অস্বীকার করা যায়! ১৯৬৬-তে ইংল্যান্ডের চতুর্থ ডিভিশন ফুটবল লিগের খেলা চলছিল চেস্টার ও আন্ডারশট দলের মধ্যে। ফুটবল খেলায় কড়া ধাঁচের শারীরিক সংঘর্ষ ঘটা কোনো অবাক কাণ্ড নয়। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে চেস্টার দলের দুজন ফুলব্যাকই গুরুতর আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। এতটাই গুরুতর আঘাত যে তাদের মাঠ থেকে স্ট্রেচারে শুইয়ে বাইরে নিয়ে যেতে হয়েছিল। এবং তাঁরা দুজনেই জোন্স। রে জোন্স ও ব্রায়ান জোন্স। আঘাতেও কী মিল! দুজনেরই বাঁ-পা ভেঙেছিল। দুঃখের ছন্দ বোধহয় এমনই হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দুই জোন্স একই হাসপাতালের একই ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন।

১/৩

তা দুঃখের কথাও যেন অদৃশ্য আহ্বানে অন্য এক মর্মান্তিক ঘটনাকে ডেকে আনে। ইরাকের একটা লিগ ম্যাচে একটা দল এক গোলে পিছিয়ে আছে। খেলার নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিট হাজির। চমৎকার দক্ষতায় পিছিয়ে থাকা দলটির একজন খেলোয়াড় নিজেই গোলটা শোধ করার পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন অসুস্থ মানসিকতার দর্শক নির্ভুল নিশানায় সেই খেলোয়াড়টিকে গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০৯ সালের মার্চ মাসে।

১/৪

ফুটবলারদের কুসংস্কার যে কতদূর যুক্তিহীন ও বিচিত্র হতে পারে তা লিখে বোঝানো বেশ কঠিন কাজ। ইংল্যান্ড দলের বিখ্যাত ডিফেন্ডার গ্যারি নেভিল যখন পরপর কয়েকটা ম্যাচ জিততেন তখন একই বুটজোড়া ব্যবহার করতেন। অন্য বুটগুলোর দিকে নজরই দিতেন না। শুধুই ঘামের গন্ধযুক্ত, নোংরা হয়ে যাওয়া একই বুটজোড়া তাঁর সাফল্যের কারণ ছিল না বোধহয়। দাড়ি কামানোর পর একই গন্ধের 'আফটার শেভ'-ও ব্যবহৃত হত। কারণ, নেভিল সাহেব ওইগুলোর উপস্থিতির জন্যই ম্যাচ জিততেন তো!

১/৫

ফুটবল মাঠে ফুটবলাররা যা করার তাই করার চেষ্টা করেন নিশ্চয়। কিন্তু দর্শকরা কবে আর সারাক্ষণ খুশি থেকেছেন। একটু অন্যধরনের দর্শক হলে তো কথাই নেই, যা মুখে আসে তা-ই বলেন। তা সেই ভাষা খুব খারাপ হলেও কে কী করতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো দর্শকদের মনেও লজ্জা বা দুঃখ এসে হাজির হয় বৈকি। একদা ইংল্যান্ডের 'নটিংহ্যাম ফরেস্ট' দলের কিছু সমর্থক অশ্রাব্য ভাষায় গান গাইলে, সেই দলের ফুটবলার Brian Clough সাংবাদিকদের কাছে সেই সমর্থকদের আচরণের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তারপরেই মাঠে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। সমর্থকদের একটা দল ব্যানার নিয়ে হাজির, সেই ব্যানারটিতে লেখা ছিল - "Sorry Brian"

১/৬

ফুটবল মাঠের সেরা দর্শক কে? এমন অদ্ভুত প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ৮১ বছর বয়স্ক Norman Windram ২০০২ সালে এই রকম দাবি করেছিলেন যে, তিনি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড-এর কোনো ম্যাচেই কখনো অনুপস্থিত ছিলেন না। তা ম্যানইউ (ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড)-এর সমর্থক উইনড্রামমশাই তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কিছু পরিসংখ্যানও পেশ করেছিলেন বৈকি। নিজের চার বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রিয় দলের খেলা দেখতে শুরু করেছিলেন। সেটা ছিল ১৯২৬। তাঁর দেখা মোট খেলার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮০৩।

কিচির মিচির-এর ছোটো বন্ধুদের একটা আনন্দের খবর দেব। শুরু হচ্ছে আমাদের দাবা চর্চা। যদিও মনে রাখবে ৬৪ খোপের এই কৌশলী খেলায় পারদর্শী হওয়ার জন্য কাগজের দাবা চর্চা যথেষ্ট নয়। তবুও এই স্তম্ভ খেলার ধাঁচটা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে আশাকরি কার্যকরী। দাবা খেলা সম্পর্কে অনেকেই মনে করেন, কোনো শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজন নেই, বসে বসে খেলা। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তার বিপরীত। একজন ভালো দাবাড়ু হতে গেলে চাই ভীষণরকম ফিটনেস। মস্তিষ্ককে সচল করার জন্য, চিন্তার গভীরতা আনার জন্য, দিনের যে কোনো সময়ে অত্যন্ত একঘণ্টা ঘাম ঝরানো ব্যায়াম বা হাঁটা খুবই জরুরি। এইসব বিষয় এবার থেকে নিয়মিত কিচির মিচির-এর পাতায়। লিখছেন প্রাক্তন জাতীয় দাবাড়ু *প্রণবকুমার চক্রবর্তী*।

শিশুসাহিত্য সম্রাট হেমেন্দ্রকুমার রায়

(৮ পাতার পর)

অজানা কোনও দ্বীপ, এমন কী ভিনগ্রহও। বাঙালিকে তিনিই সম্ভবত ভিনগ্রহে পাঠিয়েছিলেন তাঁর 'মেঘদুতের মর্তে আগমন' উপন্যাসে। ১৯৩৭ সালে 'দেব সাহিত্য কুটির' থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর 'জয়ন্তর কীর্তি' উপন্যাস। বিমল-কুমার জুটির মত জয়ন্ত-মানিকও তাঁর অমর সৃষ্টি। তাদের সঙ্গী পেটুক মজাদার পুলিশ ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু। এদের নিয়ে তিনি লিখেছেন 'চাবি ও খিল'-এর মতো বেশ কিছু গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। শুধু গোয়েন্দা বা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিই নয়, ঐতিহাসিক কাহিনি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। 'আলো দিয়ে গেল যারা', 'ভগবানের চাবুক', 'দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান', 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট'- একের পর এক ঐতিহাসিক আখ্যান তিনি লিখে গেছেন।

'পৃথিবীতে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে অনেক, কিন্তু সে সব ঘটনা বিশ্বাস করে এমন লোক খুব বেশি পাওয়া যায় না। আমার জীবনেও একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল, তা শুধু আশ্চর্য্য নয় অত্যাশ্চর্য্যও বটে। তোমাদের কাছে সেই কথাই আজ বলব, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, বিশ্বাস করো; না করলেও দুঃখিত হব না'- এমনই ভূমিকা দিয়ে শুরু হয়েছিল হেমেন্দ্রকুমারের বিখ্যাত ভৌতিক গল্প 'শয়তান'। শিশু-কিশোররা ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিশ্বাস করুক বা না করুক তাদের কাছে ভৌতিক গল্পের টান অমোঘ। 'শয়তান', 'এক-রাতের ইতিহাস', 'কঙ্কাল-সারথি', 'ভূতের রাজা', 'কান-কাটা হাঁচি', 'বিজয়ার প্রণাম', 'শয়তানী-জুয়া' ইত্যাদি অজস্র, অদ্ভুত, গায়ে কাঁটা দেওয়া ভূতের গল্প লিখেছেন হেমেন্দ্রকুমার। ঠিক যেমন লিখেছেন 'একরত্তি মাটি', 'চোরাই বাড়ি', 'বনবাদাড়'-এর মতো ছোটো গল্প। লিখেছেন আর্থার কোনান ডয়েলের উপন্যাসের ছায়ায় রচিত 'চতুর্ভূজের স্বাক্ষর', 'নিশাচরী বিভিষীকা', 'বাঘরাজ্যের অভিযান', 'গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন' 'প্রহেলিকা' সিরিজের চারটি উপন্যাস। রহস্য, অ্যাডভেঞ্চার, ইতিহাস, ভাবানুবাদ বা ভৌতিক কাহিনি বা প্রবন্ধ, গদ্যসাহিত্যের সব শাখাতেই অবাধ বিচরণ ছিল শিশুসাহিত্য সম্রাটের। রবীন্দ্রনাথ একবার হেমেন্দ্রকুমারকে বলেছিলেন 'আজকাল যারা ছোটদের জন্য লেখেন-তাঁদের কেউ কেউ একটা ভুল করেন। তাঁরা মনে করেন লেখার ভিতরে ছেলেমানুষি থাকলেই তা ছোটদের উপযোগী হবে, তা তো নয়। ছোটরা মনে মনে নিজেদের বড় বলেই ভাবে। লেখার ভিতর ছেলেমানুষি প্রকাশ পেলে তারা মনে করে, লেখক তাদের শিশু ভেবে অবজ্ঞা করছেন। তারা খুশি হয় না'। রবীন্দ্রনাথের কথাটা আজও শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক। বড়োদের সাহিত্য লেখেন তেমন কিছু প্রথিতযশা সাহিত্যিক আজও মনে করেন শিশু-কিশোর সাহিত্য মানেই হেলাফেলার লেখা, সে জন্য তাঁদের কলম থেকে উঠে আসে না 'যখের ধন', 'আবার যখের ধন', 'পদ্মরাগবুদ্ধ'র মতো কোনো কালজয়ী উপন্যাস। যা শুধু ছোটোদের নয়, সব বয়সি পাঠকদেরই যুগের পর যুগ ধরে তৃপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। আফ্রিকার শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল বা তুষারাবৃত হিমালয় অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের অজানা দ্বীপের বিবরণ, এ সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে, যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে পাঠকদের কাছে তুলে ধরতেন তিনি। যার জন্য প্রচুর পড়াশোনা করতেন। তাঁর পাঠকরা শিশু-কিশোর বলে কোনো ফাঁকি দিতেন না তিনি। মনে রাখতে হবে, হেমেন্দ্রকুমার রায় যখন লিখছেন তখন ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল বা ইন্টারনেট ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়নি। শিশুসাহিত্যের অন্যতম শর্ত হল, শিশুমনের কল্পনা শক্তিকে উসকে দেওয়া, বিশ্বপ্রকৃতিকে তাদের সামনে উন্মোচিত করা, পৃথিবীর সাথে শিশুমনের মেলবন্ধন ঘটানো, তাদের মানসিক ভাবে দৃঢ় করে তোলা- এ সব কটি কাজ তাঁর লেখার মাধ্যমে করে গেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্র একবার বলেছিলেন, 'হেমেনবাবুর মতো অমন ডেডিকেটেড শিশু সাহিত্যিক আমাদের মধ্যে আর একজনও নেই।' প্রেমেন্দ্র মিত্রর কথার সত্যতা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষেও তাঁর রচনাগুলো শিশু-কিশোর সাহিত্যে কাবাগো পাহাড়ের সম্রাট লেলানার রত্নপেটিকার মতোই শিশু-কিশোর পাঠককে আকৃষ্ট করে। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাই আজও শিশুসাহিত্য সম্রাট।

কৃতজ্ঞতা :

১) হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী (বসুমতী)

২) যাদের দেখেছি - হেমেন্দ্রকুমার রায়।

৩) শারদীয়া সন্দেশ ১৪২০

অঙ্কন : ইশিতা দাশগুপ্ত

শ্রেণি : সপ্তম, কল্যাণী জুলিয়ান ডে স্কুল

আঁকি-বুঁকি

অপ্রতিম ভক্ত
শ্রেণি -
আপার নার্সারি
দি স্কটিশ চার্চ কলিজিয়েট স্কুল

তোমাদের জন্য এই প্রতিযোগিতা। প্রতি সংখ্যায় আমরা দেবো একটি কাল্পনিক বিষয়। তোমাদের কাজ হবে সেই বিষয়ের ওপর ২০০ শব্দের মধ্যে লিখে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া। চুপিচুপি বলে রাখি, বাবা-মা বা বড়োদের সাহায্য নিলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পেরে যাবো। লেখা হলেই আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। খামের ওপর লিখবে -

মেলে দিলেম ইচ্ছেডানা

প্রযত্নে - **কিচির মিচির,**

৯, কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১

পাঠাতে পারো ই-মেল করেও। আমাদের ই-মেল - kichirmichirkol@gmail.com। লেখা পাঠাতে হবে ২২ এপ্রিলের মধ্যে। লেখা হবে ফুলস্কেপ কাগজের একপিঠে। দু'পাশে যথেষ্ট ছাড় দিয়ে লিখবে। নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণি পরিস্কার করে উল্লেখ করবে।

: প্রতিযোগিতার বিষয় :

ফেলুদার অ্যাসিস্ট্যান্ট তোপসের জায়গায় তুমি কেন যোগ্য?

অনু-তথ্য

''নিরীহ পাখির প্রাণ করিলে সংহার,
খ্যাতি অমরত্ব লাভ হবে না তোমার।'' - বাল্মিকী

- ঋষি বাল্মিকী'র মুখ থেকে প্রথম নিঃসৃত হয়েছিল ছন্দের আকারে। বাল্মিকীর 'শোক' থেকে কবিতার উৎপত্তি হয়েছিল বলে, কাব্যের এই ছন্দকে 'শ্লোক' বলে।

তথ্যসূত্র : *শিশুভারতী, কবিতা চয়ন, পৃষ্ঠা ১৫৭*

ইন্দ্রনাথ বাড়ুই

কিচির মিচির

প্রযত্নে: প্রসেনজিৎ সরখেল

9 কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - 711 101

ফোন: 8017155417

পটে আঁকা ছবি

"আগার ফিরদৌস বি-রোয়াই জামিন আস্ত, হামেন-আস্ত হামেন-আস্ত, হামেন-আস্ত,"

জাহাঙ্গিরের বর্ণিত এই শব্দগুলি যে কতটা পরিমান সত্যি যারা কাশ্মীর যাননি তারা কখনোই বুঝতে পারবেন না। তাই তো এই জায়গার আরেক নাম ভূ-স্বর্গ - পৃথিবীর স্বর্গ।

হঠাৎ করে ঠিক হল কাশ্মীর ভ্রমণের কথা। জম্মু থেকে শ্রীনগরের রাস্তায় পৌঁছাতেই চোখ জুড়িয়ে গেল রাস্তার দুধারে উইলো গাছের (যে গাছ দিয়ে ক্রিকেটের ব্যাট বানানো হয়) সারি, দুপাশে সর্ষে ফুলের আগুন আর ঝিলম নদীর সৌন্দর্য। পাহাড়ি রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ নজরে পড়ল বরফ-চুড়ো পাহাড়। খানিকটা যেতেই চোখে পড়ে গেল কাশ্মীরের জনপ্রিয় ডাল লেক। অনেক আকাঙ্খিত ডাল লেকের শিকারায় ভ্রমণ, মনে এক অদ্ভূত অনুভূতি এনে দিল। সেটায় চড়ে দেখতে পেলাম মীনা বাজার, ফ্লোটিং গার্ডেন আর তার সঙ্গে অনেক সিরিয়াল ও সিনেমা খ্যাত হাউসবোট। শিকারায় কাশ্মিরী ড্রেস পড়ে কত ছবিও তুললাম।

পরের দিন সকালে চলে গেলাম গুলমার্গ - সত্যি ভূ-স্বর্গেরই রূপ - ভারতের সুইজারল্যান্ড। বরফের রূপ যে এত সুন্দর হতে পারে তা গন্ডোলায় না চড়লে বুঝতে পারতাম না। পৃথিবীর

ছাদের সমস্যা? ঘরে জল পড়ছে?
১০-১৫ বছর নিশ্চিত থাকুন।
গ্যারান্টি যুক্ত ম্যাক্রোপেষ্ট
লাগান, ছাদ বাঁচান।
ব্যানার্জি অ্যান্ড ব্যানার্জি : ৯৩৩৯৭৭৭৫৩১

উচ্চতম গন্ডোলায় (১০ হাজার ফুট) উঠে নিচটাকে মনে হচ্ছিল যেন পটে কোনো ছবি আঁকা। বরফ লোফালুফি, ছোড়াছুড়ি খেলার সাথে আরেকটি অভিজ্ঞতা হল স্লেজগাড়ি চড়া। এখানে অবশ্য ইগলুদেশের কুকুরদের বদলে মানুষই স্লেজগাড়ি টানে - যাই হোক সেটা যে খুবই রোমাঞ্চকর তা আর বলার নয়। এই দেখে মন সার্থক করার পর বিকেলে গেলাম আরেক অপূর্ব জায়গা - টিউলিপ গার্ডেন। টিউলিপের যে এত রূপ তা তা সামনে থেকে না দেখলে কিছু অংশও অনুমান করা যায় না।

ভালো লেগেছে, শালিমার বাগ, চশমাশাহী ইত্যাদি মুঘলদের তৈরি বাগানগুলি। কথিত আছে, এই চশমাশাহী থেকে পাহাড় নিঃসৃত জল পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করতেন জওহরলাল নেহরু। কিন্তু সর্বোপরি টিউলিপ গার্ডেনের রূপ সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। বিভিন্ন রঙের সমাহারে টিউলিপগুলিকে রামধনুর মতো মনে হয়েছে। তারপর গেলাম শোনমার্গ আর সেখান থেকে গেলাম বালতাল, অমরনাথ যাওয়ার রাস্তা। কাশ্মীরের কাছেই আখরোট বাগানঘেরা এক পাহাড়ি গ্রাম 'পহেলগাঁও'। তার চারদিক ঘিরে রাখা বেতাব ভগলি, আরু ভগলি, চন্দনবাড়ি আর লিডার নদীর সৌন্দর্য যেন পরিপূর্ণ করেছে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের রূপ।

অভীপ্সা বক্সী
শ্রেণি : ষষ্ঠ
দি ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুল,কলকাতা

আমার বাংলাদেশ ঘোরা

ফড়িপাতা

বাংলাদেশ হল একটি নদীমাতৃক দেশ। জায়গাটা খুবই সুন্দর। চারিদিকে গাছ-গাছালি। সবুজ, শস্য-শ্যামলা এই দেশটি। একবার আমি, আমার ভাই, মা ও বাবা সবাই বাংলাদেশে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার মামার বাড়ি নওগাঁ। এর আগে ছোটো থাকতে একবার গিয়েছিলাম। মামার বাড়িতে দাদু-দিদা, মামা, মাসিদের নিয়ে খুব মজা করলাম। ভাই তো ছোটো, সারাদিন ধরে খালি ওর দুষ্টুমি দেখতে হত। নওগাঁ জায়গাটা খুবই সুন্দর। চারিদিকে যেন একটা গ্রামের মতো। মামার বাড়ি থেকে আমরা অনেক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। তারমধ্যে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল কক্সবাজার বিচ আর

ঢাকার মীরপুর চিড়িয়াখানা। কক্সবাজার বিচ পৃথিবীর অন্যতম সেরা সমুদ্র সৈকত হিসেবে পরিচিত। মীরপুর চিড়িয়াখানাটা খুবই বড়ো। আমার ভাই সেখানে নানা রকম পশুপাখি দেখে খুব আনন্দ করেছে। আমিও খুব আনন্দ করেছি। সেখানকার পরিবেশ অনেকটাই অন্যরকম। সেখানে বেশিরভাগ জায়গায় পাট ও ধান চাষ দেখা যায়। সবকিছু মিলিয়ে এবারের বাংলাদেশ ঘোরাটা খুবই মজার হয়েছে। আশা করি আগামীতে আবার যখন বাংলাদেশ যাব তখন আরো মজা করব, আরো অনেক জায়গায় বেড়াব। এখানেই শেষ করছি। টাটা ..

ঐশী কৈরী
শ্রেণি : সপ্তম
ওয়েল এন্ড গোল্ডস্মিথ

কয়লার আত্মকথা

আমি একটি কয়লার টুকরো। রাস্তার ধারে পড়ে আছি। গায়ের রং কালো। আর ভালো লাগে না। কত কোটি বছর আগে আমি এখানে গাছ হয়েছিলাম। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমি মাটিতে চাপা পড়লাম। এভাবে কোটি কোটি বছর কাটালাম। একদিন দেখলাম, একজন লোক মাটি খুঁড়ে আমায় তুলল। তারপর দেখলাম অনেক কিছু। বুঝলাম, আমাদের তোলার জন্যই তারা মাটি খোঁড়ে। এখন আমি কয়লার ছোট্টো টুকরো বলে সবাই তুচ্ছ করছে। কিন্তু যদি আমি মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক পদার্থ পেতাম তাহলে আমি পরিণত হতাম হীরেতে। তখনতো আমায় কেউ তুচ্ছ করতো না। তাছাড়া আমাদের, কয়লা দিয়েই যে তাপবিদ্যুৎ তৈরি হয় তাও ব্যবহার করে মানুষরাই। তাহলে আমার প্রশ্ন মানুষ আমাদের এতো তুচ্ছ করবে কেন?

অরিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রেণি : ষষ্ঠ
মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রম উচ্চবিদ্যালয়, হুগলি

আমি কিচির মিচির-এর গ্রাহক হতে চাই

আমার নাম: .....

স্কুলের নাম: .....

বাবা/মা'র নাম :.....

ঠিকানা : .....

.....

টেলিফোন (এসটিডি কোড) : ..... মোবাইল : .....

ই-মেল : .....

জন্ম তারিখ : ..... সদস্য : রুপোলি/সোনালি .....

অনুগ্রহ করে সঙ্গে প্রদত্ত নগদ..... টাকা /চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্ট নম্বর .....

তাং ..... কিচির মিচির গ্রাহক চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করবেন।

মাস	সংখ্যা	প্রতি সংখ্যা	গ্রাহক মূল্য	সাশ্রয়	গ্রাহক পদ
১২	২৪	১০/-	২০০/-	৪০/-	রুপোলি গ্রাহক
২৪	৪৮	১০/-	৪০০/-	৮০/-	সোনালি গ্রাহক

কলকাতার বাইরের চেক-এর ক্ষেত্রে ২০/- অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক চার্জ দিতে হবে।

কিচির মিচির-এর পক্ষে রিমা ঘোষদস্তিদার কর্তৃক ৯, কৈলাস ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং তাজ এন্টারপ্রাইজ, ৬ মণীন্দ্র মিত্র রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদীপ্ত চক্রবর্তী।
E-mail : kichirmichirkol@gmail.com.
Title registration - WBBEN14929/25/1/2014-TC.